ইষ্টভৃতি-মহাযজ্ঞ

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Satsang - Intobhriti Mohajoggo

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা।

প্রথম প্রকাশ—১১০০
১লা বৈশাখ, ১৩৭১
দ্বিতীয় সংস্করণ—২১০০
১লা মাঘ, ১৩৭২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস
সৎসঙ্গ, এস্-পি।

মূল্য—১'২০

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

মদীয় পিতৃদেব

এবং

দীক্ষাদাতা ঋত্বিগ্‌দেবতার

শ্রীহস্তে—

Satsang - Intobhriti Mohajoggo

নিবেদন

ইষ্টভৃতি-প্রসঙ্গে বই লিখব, একথা কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু ইষ্টভৃতি নিয়ে অনেকের অনেক রকম প্রশ্ন ও সন্দেহ দুনিয়ায় র'য়েছে। এগুলির সমাধানকারী উত্তর একটা জায়গায় থাকা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে আমার পরম-উপাস্য ইষ্টদেব কিছুদিন পূর্ব্বে আদেশ ক'রলেন এ-সম্বন্ধে লিখতে। তাঁ'র আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে কাজে হাত দিলাম। বহু প্রামাণ্য গ্রন্থাদি দেখে-শুনে মাত্র ১২ দিনের মধ্যে এই পুস্তক রচনা সমাপ্ত ক'রলাম। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বক্ষণের জন্য আদেশ ছিল—খুব তাড়াতাড়ি চাই। তাঁ'রই অসীম কৃপাবলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আজ প্রকাশিত হ'ল। সেই রাতুল চরণ-যুগলে প্রথমেই জানাই আমার হৃদয়ের অনন্ত প্রণতি।

ব্যস্ততার ফলে আমার কথা আমি গুছিয়ে ব'লতে পেরেছি কিনা জানি না। ভরসা এই যে, পুস্তকটি মুদ্রণের প্রাক্কালে আমার শ্রদ্ধাস্পদ শৈলেনদা, বিশুদা, সুশীলদা, শরৎদা ও প্রফুল্লদা প্রতিটি বিষয় ভাল ক'রে দেখে দিয়েছেন। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। সৎসঙ্গ প্রেসের কর্ম্মিগণ, যাঁ'রা এই পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু প্রকাশনার কাজে পরিশ্রম ক'রেছেন এবং যাঁ'দের কাছে আমি এ-ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা

পেয়েছি, প্রত্যেককেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। অগ্রজোপম শ্রীযুত প্রফুল্লদা সর্ব্বাঙ্গীণ-পরিচিতিযুক্ত একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অশেষ স্নেহঋণে বেঁধেছেন।

গ্রন্থমধ্যে কোথাও সংস্কার্য্য বা সৌষ্ঠব-বিধানযোগ্য কোন সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

ঠাকুর-বাংলো
সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৬ই চৈত্র, সোমবার
১৩৭০

নিবেদক—
গ্রন্থকার



আমাদের সত্তা মূলতঃ শাশ্বত, সনাতন, অখণ্ড ও অনন্ত। কিন্তু দেশ, কাল, নাম, রূপ, পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির আবর্ত্তের মধ্যে যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের চেতনা ও চলন স্বতঃই খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী হ'য়ে উঠতে চায়। এইখানেই হয় সত্তার পরাজয়। এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ হ'লো যোগযুক্ত জীবন-যাপন করা। এই যোগ কার সঙ্গে? তার উত্তর হ'লো, সর্ব্বময় যিনি, সর্ব্ব-স্বরূপ যিনি, সেই অখণ্ড উৎসের সঙ্গে। তাঁর নাগাল আমরা পাব কোথায়? পাব বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীবন্ত নর-বিগ্রহের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ততার উপর জোর দিতে গিয়ে আমরা জাগতিক জীবনে পরাস্ত হ'য়ে যাব না তো? না, তা' মোটেই নয়, বরং সপরিবেশ ইষ্টানুগ, কর্ম্মমুখর, প্রীতি-প্রবুদ্ধ, সেবাসন্দীপ্ত, উৎসবনন্দিত অনুচলনে যুগপৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের আলিঙ্গনে সংহত, শান্তিময়, জয়যশমণ্ডিত, ঐক্যবিধৃত, পরাক্রমী, দিব্য জীবনের অধিকারী হ'তে পারব। এবং তা' কেমন ক'রে, তার অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত ক'রেছেন

লেখক 'ইষ্টভৃতি-মহাযজ্ঞ' নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকে। পরম-প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসরণে নানা শাস্ত্রীয় সমর্থন ও উপযোগী উদ্ধৃতিসহ, অখণ্ডনীয় যুক্তি ও তথ্যের অবতারণায়, আবেগসমন্বিত প্রত্যয়-প্রদীপনায়, সহজ-সরল ভাষায়, মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে কুড়িটি নিবন্ধে লেখক তাঁ'র বক্তব্য সুনিপুণভাবে উপস্থাপন ক'রেছেন এই পুস্তিকায়।

প্রবৃত্তি-প্রহত জগতের জীয়নকাঠি হ'লো ভক্তি। এই ভক্তি মাতাপিতাকে কেন্দ্র ক'রে ক্রম-উৎসারণায় ধীরে-ধীরে ইষ্টে সার্থকতা লাভ করে। কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুরাগ আবার ভূমায়িত হ'য়ে বিরাট্ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। এই সুকেন্দ্রিক সাত্বত সক্রিয় বিশ্বপ্রীতিই মানুষকে ব্রহ্মাবগাহী আনন্দের অধীশ্বর ক'রে তোলে। তার যা'-কিছু চিন্তা, কর্ম্ম ও বাক্য নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত হয় ইষ্টার্থে। তার গোটা জীবনটা হ'য়ে ওঠে নানা বৈচিত্র্য-সমন্বিত এক অচ্ছেদ্য ও অচ্ছিদ্র, একায়নী ইষ্টারতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ-বিশেষ। এতেই হয় বহুত্বের মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা, সীমার বুকে অসীমের সাধনা, মর্ত্ত্যের ধূলিতে অমরত্বের স্থাপনা। পরিবর্ত্তনের স্রোতের মধ্যে থেকেও মানুষ তখন নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরন্তন জীবনের মর্ম্মদেশে অধিষ্ঠিতি লাভ করে। দয়াল ঠাকুর আমার সেই ভক্তিরসসিক্ত মহাজীবনলাভের গোপন কৌশলটি উদ্ঘাটিত ক'রেছেন মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতির বিধান রচনা ক'রে। ইষ্টভৃতির কথা ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে

শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ সংশ্লিষ্ট সব-বিষয়ের উপরই আলোকপাত ক'রেছেন। পিতা, মাতা ও আচার্য্যকে নিত্য নিষ্ঠাসহকারে দেওয়া-থোয়া, সেবা করা, তাঁদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলা, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করা, তাঁদের প্রীতি-কর্ম্ম ও সুখস্বস্তি-বিধান ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে কেমন ক'রে তাঁদের প্রতি ভাবভক্তি পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে সর্ব্বপ্লাবী হ'য়ে ওঠে, তার সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান-সম্মত আলেখ্য এই পুস্তকে মিলবে।

আমার মনে হয়, ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞও বটে, আবার মহাযোগও বটে। ভীত, ত্রস্ত, বিপন্ন, বিভ্রষ্ট, আর্ত্ত ও দিশেহারা মানবকে যদি আজ অভয়জীবনে, অমৃতজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে হয়, তবে তাকে সর্ব্বপ্রথম খুঁজে বের ক'রতে হবে মহাযজ্ঞেশ্বরকে, মহাযোগেশ্বরকে, আর তাঁর নিষ্ঠানন্দিত অনুসরণ ও অনুচর্য্যায় জীবনকে ক'রে তুলতে হবে সাত্বতপন্থী। সেই যজ্ঞময়, যোগযুক্ত চলনই সসাগরা ধরণীর বুকে প্রতিটি মানুষের জীবনকে ক'রে তুলবে আনন্দমধুর। তারই স্বস্তিবাচন সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে এই শীর্ণ-কলেবর গ্রন্থে। আমরা এই কল্যাণবুদ্ধিপ্রণোদিত প্রকাশনাকে শ্রদ্ধানন্দিত চিত্তে 'স্বাগতম্' জানাই।

বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৫ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৭০
২৯।৩।৬৪

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

Satsang - Intobhriti Mohajoggo

সূচীপত্র

Satsang - Intobhriti Mohajoggo

প্রথম অধ্যায়

জীবন-কামনা

জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, সে বাঁচতে চায়। ম'রতে চায় না কেউই। এমন-কি মানুষ যখন শোকে-অভিমানে জর্জ্জরিত হ'য়ে বলে, 'ম'রলে বাঁচি' তা'রও মানে, সে বাঁচতে চায়, ঐ কষ্টভরা জীবন থেকে মুক্ত হ'য়ে সে পেতে চায় আরো আনন্দময় বৃহত্তর একটা জীবন। সেখানেই সে বাঁচতে চায়। প্রতিদিনই দুনিয়ায় নানাভাবে অসংখ্য মানুষ মারা যা'চ্ছে; কিন্তু বেঁচে যা'রা থাকছে তা'রা ভাবছে— আমরা চিরদিনই বেঁচে থাকব। এই ব্যাপারটাই সব থেকে বেশী আশ্চর্য্যজনক ব'লে যুধিষ্ঠির ব'লেছিলেন যক্ষরূপী ধর্ম্মকে। এই জীবনপিপাসা জীবের চিরন্তন চাহিদা।

কিন্তু শুধু কি কোনরকমে বেঁচেই থাকতে চায় মানুষ? আর কি কিছুই চায় না? না, তা' নয়। আরো কিছু চায়। ঐ বাঁচার সাথে সে চায় একটু শান্তি,

একটু স্বাচ্ছন্দ্য। এটুকুও তা'র কাম্য। তথাকথিত কোনরকমে দু'টি পেটে খেয়ে একখানি কাপড় পরার ব্যবস্থা ক'রে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। সে দেখেছে, ঐ জীবনে অন্য ইতর প্রাণীদের সাথে তা'র কিছু পার্থক্য নেই। তা'রাও খায়-দায়, চলে-ফেরে, সংসার করে, আবার একদিন ম'রে যায়। তা'তে লাভ হ'ল কী? কী পাওয়া গেল? জীবনটার কোন মানে বোঝা গেল? এই চিন্তা তা'কে অস্থির ক'রে তুলল, এগিয়ে নিয়ে গেল তা'কে ক্রমবর্দ্ধনার দিকে।

মানুষের প্রসঙ্গ এখানে এল, কারণ মানুষই সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। তাই, তা'দের নিয়েই আমাদের প্রধানতঃ আলোচনা।—ঐ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষ বাড়ী গ'ড়েছে, গাড়ী চালিয়েছে, অর্থ উপার্জ্জন করেছে। সর্ব্বদাই সে অনুসন্ধান ক'রে চ'লেছে, কিসে সে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হ'তে পারবে। পরিশেষে তা'র পরিশ্রান্ত মন উপনীত হ'য়েছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়।

এই আকাঙ্ক্ষার আপূরণের জন্য মানবমস্তিষ্ক যতখানি সজীব ও উর্ব্বর হ'য়ে উঠতে পারে, তা'ও হ'য়ে উঠল। একে-একে আবির্ভূত হ'ল কতরকমের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, ক্রীড়াকৌতুক

ইত্যাদি। পর্ব্বতশীর্ষের আরোহী থেকে সমুদ্রের অতল-প্রদেশে-নামা ডুবুরী পর্য্যন্ত সবাই যেন পৃথিবীকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দেখতে লাগল। কিন্তু সন্তুষ্ট হ'তে পারল না। অসীম ঐশ্বর্য্যের মালিক থেকে অতি দীনদরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সবারই কথা—এতে তো হ'ল না। আরো কিছু চাই, যা' প্রাণটা পুরিয়ে দেবে, মনে শান্তি আনবে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যেই মানুষ দিবারাত্র অস্থির হ'য়ে ছুটে চ'লেছে। নিরন্তর কর্ম্মপ্রবাহ তা'কে টেনে নিয়ে চ'লেছে বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে, গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে। এই লক্ষ্য-প্রাপ্তির জন্যই রাজকুমার শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ ক'রে-ছিলেন, শঙ্কর-রামানুজ জ্ঞানচর্চ্চায় নিমগ্ন হয়েছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিপ্রেমে দেশ আলোড়িত ক'রে তুলেছিলেন। এরই জন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ বারংবার অমৃতলাভের বার্ত্তা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা ক'রে-ছিলেন, কঠোর অধ্যবসায়-সহকারে অনুসন্ধান ক'রে চ'লেছিলেন সেই অমৃতলাভের পথ। সকলেই বুঝে-ছিলেন, এই মোটামুটিভাবে-চলা জীবনের উপর-দিয়েও চাই আরো-একটা মহত্তর জীবন। সে-জীবন বিলাস-

ব্যসনের নয়, পলায়নপর মনোবৃত্তিরও নয়। সে-জীবন হওয়া চাই অফুরন্ত ঈশ্বরভক্তিমূলক কর্ম্মময় মহাজীবন। ঈশ্বরমুখী মন ছাড়া জীবনের সার্থকতা বোধ করা যায় না। ঐ মনোভাব না থাকলে অনেক কিছু করার পরেও মনে হবে, কী ক'রলাম সারা জীবনে। তাই, অনেক সময় অনেক বৃদ্ধ লোককে সমস্ত জীবন-কাল নিয়ে আপশোস ক'রতে শোনা যায়। কেউ-কেউ আবার সারা জীবনটাই নিরর্থক গেছে ভেবে হঠাৎ খুব ক'রে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেন। কিন্তু হায়! এর আগেই জীবনের নানারকম অনাচার-অত্যাচারে মনের ও শরীরের শক্তি অনেক ক্ষয় হ'য়ে গেছে। আর, শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিহীন জীবন দিয়ে ধর্ম্মলাভ করা একরকম অসম্ভবই বলা যায়। তাই, তখন আর অনুশোচনারও সময় থাকে না। ফলে, মৃত্যুকালেও আর শান্তি পাওয়া যায় না।

কিন্তু মহত্তর জীবনের স্বাদ যাঁ'রা পেয়েছিলেন, তাঁ'রা স্পষ্টই বুঝেছিলেন, মরণকালে হরিনামে কোন কাজ হয় না। কাজ হওয়াতে গেলে সারাটা জীবন ধ'রেই হরিনামময় হ'য়ে থাকা দরকার। ঈশ্বরভাবনা জীবনে যা'তে অটুটভাবে পেয়ে বসে তা'ই করা

দরকার। তা'র জন্য কঠোর সাধনা ও গবেষণা ক'রে যে পরম সত্যগুলি তাঁ'রা উপলব্ধি ক'রে গেছেন, সেগুলি বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। ঐগুলিই আমাদের সুখশান্তিময় জীবন-লাভের সঙ্কেত।

"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্ম্মযোগে ব'লেছেন—

"He who gives spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind,........ Next to spiritual help comes intellectual help—the gift of secular knowledge."

—যিনি মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন, তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী। আধ্যাত্মিক অবদানের পরে আসে বুদ্ধিবৃত্তির অবদান, পার্থিব জ্ঞান-দানের কথা। এখানে দেখা যা'চ্ছে, স্বামীজীও সেই পরম অধ্যাত্ম-সম্পদ্‌কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রেছেন। মহাজীবনের অধিকারী যাঁ'রা তাঁ'রা যুগে-যুগে এই একই বার্ত্তা প্রচার ক'রে এসেছেন। মানুষকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে তাঁ'রা ব'লেছেন—ওগো! ঐহিক সুখভোগে প্রমত্ত থেকে জীবনের পরিপূর্ণতার আস্বাদ হ'তে তোমরা বঞ্চিত থেকো না। জাগো,

দেখ—কী সুন্দর স্বস্তির জগৎ তোমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছে। এই বিপুলা শান্তির ক্রোড়ে এসে শান্তি লাভ কর, শান্ত হও।

কিন্তু প্রবৃত্তির কুটিল মোহে প'ড়ে ঐ সাত্বত আহ্বানকে আমরা অবহেলা করি। দেখেও দেখতে চাই না, বুঝেও বুঝতে চাই না। ফলে, জীবনে নেমে আসে নানাপ্রকার অশান্তি-বিপর্য্যয়ের ঘনঘটা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন-দেবতা

দু'টি পথ আছে জীবনের—একটি সত্তামুখী, যেখানে আছে সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার গান; আর-একটি প্রবৃত্তিমুখী, যা'র ভোগলোলুপ কবলে প'ড়ে বহু জীবন আপশোসের অধিকারী হ'য়ে ওঠে। এর একটিকে বেছে নিতেই হবে। মধ্যপন্থা ব'লে কিছু নেই। দু' নৌকায় পা রাখা যায় না। মহাজীবনের আহ্বান সত্তার আহ্বান, জীবনের জয়গান। যে বিশেষ নিয়ম-তন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে তিনি বড় হ'য়ে উঠেছেন, জন-সাধারণের কাছে তিনি ব্যক্ত করেন তাঁ'র সেই উপলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। যা'রা সেই পথের অনুসরণ

ক'রে চলে অটুট নিষ্ঠায়, কালক্রমে তা'রাও হ'য়ে ওঠে মহান্, নিয়ন্ত্রিত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এইভাবে একটি দীপ থেকে অপর দীপ প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে চলে। আর, এই নিয়ন্ত্রিত জীবনই সুখের উৎস, এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবন দুঃখের আকর। যা'-কিছু প্রচেষ্টা, যা'-কিছু সাধনা, সবটার মধ্য-দিয়ে মানুষ যদি জীবনে সুনিয়ন্ত্রণ আনতে পারে, চরিত্রকে বিনায়িত ক'রতে পারে, নিজের বাসনা-কামনার উপরে প্রভুত্ব ক'রতে পারে, তখনই তা'র সার্থকতা-বোধ জন্মে। অপরে তা'কে দেখে অবাক্ হ'য়ে যায়। দলে-দলে মানুষ ছুটে আসে তা'র কাছে বহুবিধ জীবনসমস্যা নিয়ে। আর, ঐ মানুষটিও তখন অকৃপণ-হস্তে বিলিয়ে দিয়ে চলেন তাঁ'র যা'-কিছু শিষ্ট-অভিজ্ঞতালব্ধ ধন।

তিনি মানুষকে নিয়োজিত করেন ইষ্টানুগ কর্ম্মে, তা'দের ভিতর সৃষ্টি করেন অদম্য উৎসাহ, তা'দের অন্তরের সুপ্ত সম্বেগকে প্রবল কর্ম্মোদ্দীপনায় জাগিয়ে তোলেন। মানুষ মুগ্ধ-বিস্ময়ে এই মহাজীবনের জয়-গান করে। ক্রমে-ক্রমে আসে ঐশ্বর্য্য, আসে মানুষ, আসে নামযশ। কিন্তু ঐ মহাজীবন এসবের প্রত্যাশী ন'ন। অস্খলিত থাকেন তিনি তাঁ'র আদর্শে, তাঁ'র

উদ্দেশ্যে। কূটস্থ হ'য়ে অবিচলিত থেকে তিনি লোককল্যাণ সাধন ক'রেই চলেন। পৃথিবীতে যেখানে যত এমনতর মহাজীবনের আবির্ভাব হ'য়েছে, সকলেরই এক লক্ষ্য—কিসে মানুষের মন ঈশ্বরমুখী হবে, সত্তা-মুখী হবে, কিসে সবার জীবনে আসবে সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ। তাই, জগতের প্রকৃত লোকযাজ্ঞিক মহাপুরুষগণের বাণীর মধ্যে একই সুর ধ্বনিত হ'তে দেখা যায়। এঁদের আমরা ভিন্ন-ভিন্ন নামে আখ্যায়িত ক'রে থাকি। কখনও বলি গণনেতা, কখনও যুগপুরুষ, কখনও অবতার, কখনও পুরুষোত্তম।

সবার উপলব্ধি হয়তো একই পর্য্যায়ের নয়, আবার যুগসমস্যারও প্রকারভেদ থাকে। তাই, প্রত্যেকের কথার মধ্যে কিছুটা রকমফের দেখতেই পাওয়া যায়। কিন্তু যে-জায়গাটিতে তাঁদের বোধবিজ্ঞান সম্মিলিত হয়েছে, সেটি হ'ল ইষ্টকেন্দ্রিক কর্ম্মনির্ব্বাহ। এই মূলসূত্র প্রত্যেকেরই জীবন ও বাণীতে পরিস্ফুট। এই সূত্র-পরিচর্য্যার অভাব যেখানে যত বেশী, জীবন-পরিচর্য্যার বাঁধনও সেখানে তত শিথিল। ইষ্ট-কেন্দ্রিকতাই জীবনগঠনের একমাত্র অবলম্বন।

প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন? মানুষের তো স্বাধীন

ইচ্ছা আছে, নিজের বুদ্ধি আছে, কাজ করার জন্য হাত-পা আছে। এ-সবের দ্বারাই তো সে ভালটা বুঝে নিয়ে সেইভাবে চ'লতে পারে। তা' ছাড়া, ঈশ্বর-বোধ? সে তো আপন জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারাই সম্ভব। মাঝখানে আবার ইষ্টকেন্দ্রিকতার প্রয়োজন কী?—প্রয়োজন আছে। মানুষ যদি নিজেই ভালটা চিনে-জেনে সেইভাবে চ'লতে পারত, তবে দুনিয়ায় এত গোলমালের সৃষ্টিই হ'ত না। পৃথিবীতে ভাল কথা তো কম নেই। ভাল বই, ভাল গান যথেষ্টই আছে। তবুও তো আজ ক্রমশঃই মন্দের প্রভাবই প্রবল হ'য়ে বেড়ে চ'লেছে। কেন? কারণ, শুধু কথা 'আকাশস্থ নিরালম্ব' হ'য়ে শূন্যেই বিলীন হ'য়ে যায়। কথা—শব্দসমষ্টিমাত্র, প্রাণহীন। কিন্তু সেই কথাই যখন কোন সচল জীবন্ত সম্বেগসিদ্ধ মানুষের মুখ হ'তে নির্গত হয়, তা'র শক্তি অনেক বেশী। তখন তা' বাগ্‌ব্রহ্ম। সেই শব্দ জীবন্ত হ'য়ে অন্য সুপ্ত প্রাণকেও জাগিয়ে তুলতে পারে। তাই, শুধু কথায় হবে না। চাই—ঐ কথাগুলি যা'র মধ্যে মূর্ত্তিলাভ করছে এমনতর ব্রহ্মঘোষ বা বাণীসিদ্ধ আচারবান্ মানুষ, যাঁ'র প্রতিটি আচরণের ঝলকে

ফুটে বেরোয় সৎ ও কল্যাণ। তিনিই মানুষের জীবনদেবতা।

এমনতর চিরজাগ্রত জীবন্ত পুরুষই অপরের প্রাণে মাঙ্গল্য-চেতনার সঞ্চার ক'রতে পারেন। নিজে অস্খলিতভাবে আচরণের ভিতর-দিয়ে সিদ্ধ হ'য়ে তিনি অমনতর বোধবিজ্ঞাতা হ'য়ে উঠেছেন। তাই, তাঁ'কে বলা হয়—আচার্য্য। তিনি যা' জানেন, উপযুক্ত পাত্রে তা' অর্পণ করেন। আর যা' বলেন, কাজেও তা' করেন। ঈশ্বরকে বাক্য ও মনের অগোচর ব'লে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু এইসব উপলব্ধ-ব্যক্তিদের মাধ্যমেই মানুষ ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য বোধ ক'রে থাকে। এঁরাই ঈশ্বরের প্রেরিত, নররূপে আবির্ভূত, ব্যক্ত ঈশ্বর। অতি জোরের সাথে ব'লেছেন ভগবান্ যীশুখ্রীষ্ট—

"Believe me that I am in the father, and the father in me."

(St. John, Chap.—14, Verse—11)

—তোমরা বিশ্বাস কর, আমি আমার পরমপিতাতে এবং পরমপিতাও আমাতে আছেন।—এমনতর মানুষে নিষ্ঠা আবিষ্ট হ'লে ঈশ্বর তখন আর বাক্য ও মনের

অগোচর থাকেন না। এঁরাই সদ্‌গুরু, ঈশ্বরের জাগ্রত বেদী।

তৃতীয় অধ্যায়
ইষ্ট

ঈশ্বর তো এই ধূলার ধরণী অতিক্রম ক'রে ন'ন। সব-কিছুতেই তাঁ'র অভিব্যক্তি। ঈশ্‌-ধাতুর অর্থ—প্রভুত্ব। আর, প্রভুত্ব মানে আধিপত্য, এবং আধিপত্যের মধ্যে আছে অধিপতি। অধি-উপসর্গের মধ্যে আছে ধা-ধাতু, অর্থ—ধারণ-পোষণ ; আর পতিতে পা-ধাতু, অর্থ—পালন-রক্ষণ। এই ধারণপালনী সম্বেগ বিশ্বজগতের যেখানে-যেখানে আছে, সেখানে-সেখানেই আছে ঈশ্বরত্ব। এই ধারণপালনের সম্বেগ ধূলিকণা থেকে আরম্ভ ক'রে সৃষ্টির বৃহত্তম অবদানকেও তা'ই ক'রে ধ'রে রেখেছে। ঐ ধারণসম্বেগের অভাব থাকলে বস্তু ব'লে কিছু থাকত না। কারণ, তাহ'লে ধ'রে-রাখার শক্তিটাই তো অন্তর্হিত হ'ত। এই শক্তি জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ব'লেই আমরা ব'লে থাকি—

ঈশ্বর সব-কিছুতে আছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ৬১ ॥
(১৮শ অধ্যায়)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে থেকে তা'দের নিয়মতন্ত্রারূঢ় ক'রে মায়ার দ্বারা পরিচালিত ক'রছেন। এই 'হৃদ্দেশ' হ'ল সব যা'-কিছুর অন্তর-প্রদেশ, যেখানে ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ-ক্রিয়া সুদৃঢ় আবেগে বিরাজমান। এই তিনটি ক্রিয়াবলেই ক্ষুদ্রতম পরমাণুও পরমাণু হ'য়েই আছে, আবার বৃহত্তম জ্যোতিষ্কও তা'র বিরাট্ দেহ নিয়ে মহাকাশে সতত সঞ্চরণশীল থাকতে সক্ষম হ'চ্ছে। সেইজন্যেই বিশ্বাধার পরমাত্মাকে ঋষি ব'লেছেন, তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—অণু হ'তেও অণু, মহৎ হ'তেও মহান্। তাহ'লে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কি কোন জায়গা আছে যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই? তাইতো আপ্লুতকণ্ঠে গেয়েছেন কবি—

"(আছ) অনল-অনিলে চিরনভোনীলে
ভূধর-সলিলে গহনে,

(আছ) বিটপিলতায় জলদের গায়
শশিতারকায় তপনে।"
(বাণী ; রজনীকান্ত সেন)

এই ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ ধারণপালনী আকূতি যে-ব্যক্তিত্বে যত ঘনীভূত, জাগ্রত ও স্বতঃপর, তাঁ'র ভিতরে আমরা ততখানি ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই। তিনি নিরন্তর ভজমান, অর্থাৎ তাঁ'র সেবাপ্রাণ সঞ্চালনায় সবাইকে নিয়ত সৎ-এ উচ্ছল ক'রে ধ'রে রাখেন ; তাই তিনি ভগবান্। ঈশ্বরের বিভূতি সবাতেই এবং সব-কিছুতেই অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছে। কিন্তু বিহিত স্বকেন্দ্রিক বিজ্ঞানময় আচরণের মাধ্যমে যিনি কার্য্যকারণ-সহ তাঁ'কে জেনেছেন, বোধ ক'রেছেন সেই সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তিকে, তিনিই হ'য়ে ওঠেন আচার্য্য। তাই, আচার্য্যকে বলা হয় ঈশ্বরের বেদী। তাঁ'র মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায় সেই পরম তত্ত্বকে। ঐ আচার্য্যই লোকশিক্ষক, ধর্ম্মগুরু, মানুষের জীবনপথ। এই ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের কল্পনা করা যায় না। যেমন, দয়া গুণটা ততক্ষণ বোঝা যায় না, যতক্ষণ কোন দয়ালু লোকের ভিতরে ঐ গুণের-প্রকাশ না দেখি। স্নেহ-মায়া-ভালবাসা, ঈর্ষ্যা-হিংসা-খলতা,

সব-কিছুই তাই। কোন মানুষের ভিতরে এই সবের মূর্ত্তনা দেখলে তখন বুঝি—একে মায়া বলে, একে বলে হিংসা ইত্যাদি। ধর্ম্ম ব্যাপারটিও আমরা কিছুতেই বুঝতাম না যদি কোন ধার্ম্মিক লোক না দেখতাম। ঠিক তেমনতরই, যেখানে ঐশ্বরিক বিভূতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছে, সেই ব্যক্তিত্বকে আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা ক'রে থাকি, আরাধনা করি তাঁ'র, ধ্যান করি তাঁ'কে, অর্ঘ্যনিবেদন করি তাঁ'র চরণে। তাঁ'কেই গুরুর আসনে বসাই ; বলি—"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"।

এই ব্যক্তিত্ব হ'ন সবারই ঈপ্সিত, অভিলষিত। কারণ, মানুষ তাঁ'র কাছ থেকে পায় সর্ব্বতোমুখী আপূরণ। সমস্যাজালে বিজড়িত যা'রা, তা'রা তাঁর কাছ থেকে সমাধানবাণী পায়। যা'রা দারিদ্রব্যাধিপিস্ট, তারা তাঁ'র মহান্ বাণীর অনুসরণে ঐ ব্যাধিমুক্ত হয়। যা'রা পরশ্রীকাতর, তা'রাও তাঁ'কেই ভালবেসে দরদী প্রেমিক লোককল্যাণকারী হ'য়ে ওঠে। বহু শূন্য প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, শোকার্ত্ত প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়, হতাশের বুক ভরসায় ভ'রে ওঠে। দলে-দলে মানুষ তাঁ'র কাছে আসে, তাঁ'কে সেবা করে, তাঁ'র জগৎপাবী জ্ঞানভাণ্ডারের প্রসাদমাণিক্যে নিজেদের

আঁধারঘর আলো ক'রে তোলে। আবার, এই অমৃতের আস্বাদ যা'রা পায়, তা'রা অস্থির হ'য়ে ওঠে অপরকে এর স্বাদ পাওয়াবার জন্য ; তাই, উন্মাদের মত ধেয়ে চলে তাঁ'র আগমনী বার্ত্তা নিয়ে। এইভাবে এক থেকে দশ, দশ থেকে একশতে সঞ্চারিত হ'য়ে চলে সবারই অভিলষিত অনুকূল বাণী। এইজন্য ঐ পুরুষ আখ্যাত হ'ন 'ইষ্ট' ব'লে।

তিনি সবারই ইষ্ট। পাপীরও ইষ্ট, পুণ্যাত্মারও ইষ্ট ; ধনীরও ইষ্ট, দরিদ্রেরও ইষ্ট ; পিতারও ইষ্ট, পুত্রেরও ইষ্ট ; স্বামীরও ইষ্ট, স্ত্রীরও ইষ্ট ; নারীরও ইষ্ট, পুরুষেরও ইষ্ট। সবারই চাহিদা ঐ মানুষটিকে। ইষ্-ধাতু থেকে ইষ্ট। ইষ্-ধাতু মানে ইচ্ছা করা। সংস্কৃত ইষ্-ধাতুর সাথে আবার ইংরাজী 'উইশ্'-(wish)-এর ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। 'উইশ্' মানেও চাওয়া, ইচ্ছা করা। তা'কেই মানুষ চায়—যে প্রিয়, ভালবাসার পাত্র। আর, বাঁচতে সবাই চায়। বাঁচার কথা যা'র কাছে পায়, তা'কেই মানুষ ভালবাসে। তাই, ঐ সাত্বতপন্থী প্রেমিক মহান্ ব্যক্তিত্বটি 'ইষ্ট' নামে অভিহিত হ'ন। আবার, যজ্-ধাতু থেকেও ইষ্ট হয়। তখন তার অর্থ—যিনি যজনীয় অর্থাৎ পূজনীয়।

পরমপ্রিয়কেই মানুষ পূজা ক'রে ধন্য হ'তে চায়। এই তার স্বভাব। সেইজন্য, ইষ্ট-শব্দের অর্থই হ'ল— ঈপ্সিত, পূজ্য এবং প্রেয়।

ইষ্ট বা প্রিয়তম তিনিই, কারণ, তাঁ'র মত অমনতর আর কেউ তখন থাকেন না। তিনি কেবল, তাঁ'র উপমাও তিনিই। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখতে পাই নররূপী শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব'লছেন—

"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ।"

(৫ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ কৈবল্য (কেবলের ভাব)-হেতু আমি আমারই সদৃশ। ভগবত্তা অর্থাৎ ভজনবত্তার যে পূর্ণতম বিকাশ তা' তাঁ'তেই সম্ভব হ'য়ে উঠেছে। তাঁ'র সেবা, তাঁ'র ভালবাসা, তাঁ'র অনুশীলন, তাঁ'র প্রাপ্তি, তাঁ'র দান—সবটাই অতুলনীয়। ভগবানের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি এই মানবদেহ। তাই, যুগে-যুগে মানুষের মাঝেই দেখেছি আমরা ভগবত্তার সর্ব্বাপূরণী বিকাশ। বৈষ্ণবকবি তাই ব'লেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা
সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

চতুর্থ অধ্যায়

অনুরাগ

এই মহৎ জীবনের কাছেই মানুষ পায় শান্তি, পায় পথ, পায় আনন্দ। ঈশ্বরত্ব নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ঐ মহামানবকে ভালবেসে স্বাভাবিক-ভাবেই তা'র মধ্যে জেগে ওঠে ঈশ্বরবোধ। আর, সে-ঈশ্বরবোধ জগৎকে বাদ দিয়ে অন্য একটা কিছু নয়। এই জগতের মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার মধ্যেই তাঁ'র অস্তিত্ব বোধ করা যায়। পবিত্র হাদীশ্ শরীফ-এর ঈমানকাণ্ডে আছে, ফেরেশতাগণ হজরত মহম্মদ (সঃ)-সম্বন্ধে ব'লেছেন—

"যে কেহ মানিবে মহম্মদকে, সে মানিবে খোদাকে ; আর যে কেহ অবাধ্যতা করিবে মহম্মদের, সে অবাধ্যতা করিবে খোদার।"

দেখা যাচ্ছে, নবী মহম্মদকে স্বীকার করা মানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাকেই স্বীকার করা। মহম্মদের কর্ম্মকে খোদারই কর্ম্ম ব'লে জানতে হবে। ভগবান্ যীশুর আশ্বাস-বাণী আবার শুনি—

"And whosoever shall receive me,

receiveth not me, but him that sent me."

(St. Mark, Chap.—9. Verse—37)

—যা'রা আমাকে গ্রহণ ক'রবে, তা'রা আমাকে নয়, যিনি আমাকে প্রেরণ ক'রেছেন তাঁ'কেই গ্রহণ করবে। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে জনৈক সাধক জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—"উপায় কী ?" ঠাকুর ছোট্ট অথচ পরিপূর্ণ কথায় উত্তর দিয়েছিলেন—

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁ'র বাক্য ধ'রে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সূতোর খেই ধ'রে-ধ'রে গেলে বস্তুলাভ হয়।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত)

আবার, কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে মোহভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে গভীর সান্ত্বনার সুরে ব'লছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"৩৪॥

(গীতা, ৯ম অধ্যায়)

—তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর; এইভাবে আমাকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ক'রে আমার সাথে যুক্ত হ'লে তুমি আমাকেই লাভ ক'রবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, ঐ গুরু বা ইষ্টই হ'চ্ছেন সেই অবলম্বন, যাঁ'র মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত কল্যাণের পথ লাভ করে। তাঁ'র সাথে নিরন্তর যোগ অর্থাৎ যুক্তীভাব উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিকে প্রশান্ত করে।

যেমন, শ্বেত বস্ত্রখণ্ড কোন রঙে রঞ্জিত ক'রলেই সেই রঙ্ ধারণ করে, তেমনি আমাদের জীবনটাও যে রঙে রাঙাব সেই রঙেরই হবে। এই রঙ্ করা বা রঞ্জনীকরণ কথার থেকেই অনুরাগের সৃষ্টি। অনুরাগ মানেও অনুরঞ্জিত করণ বা হওন। যা'র যেখানে অনুরাগ, তা'র চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের চেহারাও তেমনতর। দুষ্টের প্রতি অনুরাগ হ'লে ধীরে-ধীরে ব্যক্তিত্ব হ'য়ে ওঠে দোষরঙিল। একদিনে তো অনুরাগ আসে না; আর, আমরাও চিরচেতন পুরুষ নই। তাই, ঐ অনুরাগের পরিবর্ত্তনটা বোধ ক'রতে পারি না। ধীরে-ধীরে দুষ্টস্বভাবযুক্ত যখন হ'য়ে উঠি, তখন আমরা মানুষের অপ্রিয়ভাজন হ'য়ে উঠি, অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে পড়ি। ঠিক এইভাবেই ক্রমচলনে মানুষ সৎ-এ পরিবর্ত্তিত হয়। সৎ যিনি তাঁ'র অনুসরণপূর্ব্বক তাঁ'র নিদেশবাহী হ'য়ে তাঁ'র ভাবে জীবনটাকে যখন সিক্ত ক'রে রাঙিয়ে নেওয়া হয়, তখনই আসে অনুরাগ।

এই অনুরাগই জীবনের আসল সম্পদ্। অসীম ক্ষমতা, অগাধ ঐশ্বর্য্য, অপার খ্যাতি সবই নিরর্থক মনে হয়—যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে। অন্তরে দরদ বা ভালবাসা না থাকলে কিছুতেই শান্তির অধিকারী হওয়া যায় না। শুধু নিয়মবাঁধা কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন জীবনে কখনও স্বস্তি বা তৃপ্তি আনতে পারে না। সেজন্য জ্ঞানী, দার্শনিক, ত্যাগীর কাছে মানুষ যেভাবে যায়, প্রেমিক দরদীর কাছে যায় একেবারে অন্যভাবে। প্রেমিকের সাথে অন্তরের যে-যোগ স্থাপিত হয়, অন্য কারো সাথে তা' হয় না। প্রেমিকের আসন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে, কিন্তু জ্ঞানী বা দার্শনিকের আসন স্থাপিত হয় বোধবৃত্তির স্তরে, মস্তিষ্কে।

যুগ সন্ধিক্ষণে এক-একবার এক-একজন প্রেমিক দরদী পুরুষের আবির্ভাব ঘ'টেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত বিশ্বে সাড়া প'ড়ে গেছে। মধুলোভী মক্ষিকার মত কাতারে-কাতারে মানুষ গ্রহণ ক'রেছে তাঁ'র উপদেশ-বাণী, গ্রহণ ক'রেছে তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট মত ও পথ। জাতি বা বয়সের বিচার সেখানে থাকেনি। যে-প্লাবন এনেছিলেন ভগবান্ বুদ্ধদেব, তা'তে পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও বেশী মানুষ ভেসে গিয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ

দেবের প্রেমধর্ম্মের বন্যায় আপামর জনসাধারণ উন্মত্ত হ'য়ে ছুটেছিল। সেদিনও যে-ভাবের স্রোত বইয়ে দিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তা'র প্রবাহ যেয়ে আঘাত ক'রেছিল জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও মনের দ্বারে। ছুটে এল কত পুরুষ, কত নারী—তা'দের ভক্তির অর্ঘ্য বহন ক'রে। তাই, অনুরাগ বা প্রেমের মত সম্পদ্ আর নেই। সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকে আরম্ভ ক'রে ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রেমের অখণ্ড রাজত্ব। এই প্রেমধর্ম্মের বলেই প্রেমাবতার শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে এসেছিল লক্ষ্মণের মত ভাই, সুগ্রীবের মত বন্ধু, বীর হনুমানের মত বিশ্বস্ত ভক্ত-সেবক। জগতের সর্ব্বত্রই প্রেমের এই জয়গান। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বড় সুন্দর ক'রে গাইলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যেজন
কেহ না দেখয়ে তা'রে।
প্রেমের পিরীতি যেজন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥
পিরীতি-পিরীতি তিনটি আখর
জানিবে ভজন সার।

রাগমার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার ॥"

এই 'পিরীতি'ই জীবনের দম্বল। প্রীতি বা ভালবাসাবিহীন জীবন শুষ্ক, নীরস, কঠিন। আবার, সত্যিকারের প্রীতি কখনও রীতি ত্যাগ করে না, বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে কখনও চলে না তা'। বিধি-নির্দ্দিষ্ট যে-বিধান, প্রেম তা'রই অনুগমন করে। কারণ, সেখানে থাকে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা,' অর্থাৎ ইষ্টেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা, প্রিয়তমের প্রীতি-বিধানের ইচ্ছা। ভাল-বাসা মানেও তা'ই—ভালতে বাসা বা বাস করা, ভাল করা। কিন্তু ভাল করা নেই, কল্যাণ-অনুধাবন নেই, ইষ্টচিন্তা নেই অথচ প্রেম আছে, একথাও যা'—সোনার পিত্‌লে ঘুঘুও তাই। সে-ক্ষেত্রে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'ই প্রথম ও প্রধান হ'য়ে ওঠে। তাই, তা' কামেরই বিভিন্ন রূপ, প্রবৃত্তির লীলায়িত আপাতমধুর কুটিল গতি। এরই কবলে প'ড়ে আমরা অনেক সময় কামকে প্রেম ব'লে মনে করি। ফলে, যা' চাই তা' আর কোনদিন পূর্ণরূপে পাওয়া হ'য়ে ওঠে না। অশিষ্টতার জটিল পাক সৃষ্টি ক'রে-ক'রে ইন্দ্রিয়প্রীতি তা'তেই হাবুডুবু খেতে থাকে। কামের গতি প্রবৃত্তি-অভিমুখে,

কিন্তু প্রেমের গতি সত্তার শীর্ষসম্পদে। কাম পঙ্কিল আবর্ত্তের সৃষ্টি ক'রে মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করে, বাধায় অবসন্ন হয়; কিন্তু প্রেম তা'র পথের সকল বাধা অপসারিত ক'রে প্রেমাস্পদকে স্বর্গীয় বিমল আনন্দের অধিকারী ক'রে তুলতে চায়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভু-প্রবৃত্তি

মানুষের হৃদয়ে প্রেম আছেই। কারণ, পিতামাতার প্রীতি-অভিষিক্ত মিলিত জীবনের ভিতর-দিয়েই আমাদের আবির্ভাব। সেই প্রেম বীজরূপে আমাদের সত্তায় উপ্ত র'য়েইছে। এই প্রেম যোগাবেগরূপে প্রতিটি অন্তরে সক্রিয়। যোগাবেগ অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার আবেগ—প্রতিপ্রত্যেকেরই অন্তরের শিষ্ট সম্পদ্। সবাই কিছুতে-না-কিছুতে যুক্ত হ'তে চায়। এটা মানুষের সত্তার আদিম বাসনা। সেইজন্যেই কেউ ছোটে অর্থের পেছনে, কেউ নামযশের মোহে, কেউ বা ভগবৎ-প্রীতিতে মুগ্ধ হ'য়ে। এই যোগাবেগের আকুল টানেই ছেলে যাকে ভালবাসে, বন্ধুত্বের বন্ধন

সৃষ্টি হয়, পতি-পত্নীর প্রণয় অনাবিল স্থায়িত্ব লাভ করে। আবার, এই যোগাবেগেই মানুষের জীবনে ঈশ্বরানুরাগের সৃষ্টি করে, ইষ্টপ্রীতি অটুট ক'রে রাখে। মোট কথা, মানুষ একটা-না-একটাতে লেগে থাকতেই চায়। এই লেগে-থাকাটা ভালর দিকে হ'লে মানুষের সত্তাও ভাল থাকে, আর প্রবৃত্তিতে হ'লে খারাপের দিক্‌টাই বেড়ে ওঠে।

কিন্তু প্রবৃত্তি সবার জীবনে আছে। প্রবৃত্তিমুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। প্রবৃত্তির প্রভু যে হ'য়ে ওঠে, সেই হয় সত্যিকারের মুক্ত পুরুষ। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি মানুষের মধ্যেই থাকে। এইগুলিতেই বাঁধা পড়ে মানুষের জীবন। আর, তখন সেই প্রবৃত্তির ক্রীতদাস হ'য়ে চ'লতে থাকে মানুষ অসহায়ভাবে। দুঃখের বিষয়, যে অমনতর কবলে পড়ে সে নিজেও টের পায় না যে সে কতখানি অসহায়। সেইজন্য এর ফলস্বরূপ যা' ঘটে, তা'র কাছেই মানুষ নিজেকে সমর্পণ ক'রতে বাধ্য হয়। বোঝে না যে, সেগুলি তা'রই স্বকৃত কর্ম্মফল। কারণ, জানতে পারে না, তাই লোকে কপালে হাত দিয়ে বলে—'অদৃষ্ট'। কিন্তু 'অ-দৃষ্ট'

মানেই 'ন দৃষ্ট', যা' দেখা যায় না। দেখা যায় না ব'লে কারণ নেই তা' তো নয়। কারণ আছেই— আমাদের জানার বাইরে। এই যে অদৃষ্টের পরিহাস, তা' কিন্তু যে-প্রবৃত্তি আমার চালক সেই নায়ক-প্রবৃত্তিরই জন্য। একে প্রভু-প্রবৃত্তিও বলা যেতে পারে; কারণ, ঐ প্রবৃত্তিই আমার প্রভু, আমি তা'র দাস। এই প্রভু-প্রবৃত্তি যা'র যত উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ, তা'র জীবনও তত উন্নতিমুখর; আবার যা'র যত অপকৃষ্ট, তা'র জীবনও ততই ছিন্নভিন্ন, অসমঞ্জস, ভ্রান্তিময়।

তাই, এই প্রভু-প্রবৃত্তি যা'তে সৎ ও শিষ্ট হয়, তা'র জন্য জীবনের সুরুতেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রবৃত্তির বিন্যাস এমনতরই হওয়া উচিত, যা'তে তা' সর্ব্বতোভাবে ইষ্টকে অর্থাৎ কল্যাণকেই প্রতিষ্ঠা করে। ইষ্টনিষ্ঠাই যেন প্রভু-প্রবৃত্তি হ'য়ে ওঠে। তবেই তা'র দ্বারা কল্যাণের অধিকারী হওয়া সম্ভব। আর, তা' যদি না করি, তবে প্রকৃতিই আমাদের এমন শিক্ষা দিয়ে দেবে যা'র পরিণাম বড় মর্ম্মান্তিক। ভুলে-ভরা চলন নিয়ে সারাটা জীবন শুধু আপশোস ক'রেই কাটাতে হবে। কারণ, ইষ্ট

ও অনিষ্ট ছাড়া মধ্যপন্থা কিছু নেই। ইষ্টপথ বাদ দিলে অনিষ্টের শিকার হওয়া ছাড়া পথই নেই। কিন্তু ইষ্ট যা'র চলনে-বলনে, অশনে-বসনে, শয়নে-স্বপনে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তই যা'র ইষ্টরাগরঞ্জিত, ইষ্টের নামগান, ভরণ-পোষণ ও তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাই যা'র জীবনের প্রথম ও প্রধান ব্রত, অনিষ্ট তা'র ত্রিসীমানাতেও আসতে পারে না; অশিষ্টতার ক্রূর-কুটিল হাতছানি সে হেলায় উপেক্ষা করার মত শক্তিমান্ হয়।

ভগবানের কাছে, গুরুর কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই—'শক্তি দাও যেন তোমার সেবা ক'রতে পারি, বিপদে যেন হতবুদ্ধি না হই'। কিন্তু শক্তি তো বাইরের থেকে আসে না, শক্তি অন্তরেরই সম্পদ্। বিহিত অভ্যাস ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে তা'কে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্ম-পরায়ণতাই শক্তি ও সাহস বাড়ায়। আর, অসৎচিন্তা ও অসৎ-কর্ম্ম আনে ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, পাপবোধ। নায়ক-প্রবৃত্তি যা'র সৎ ও শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই চলে, সে-ই হয় প্রকৃত শক্তিমান্, আদর্শ সাহসী ও যথার্থ ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেয়নিষ্ঠা

পরিবেশের ভালমন্দ যা'-কিছু বোধ হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে। দুই রকমের স্নায়ু আছে আমাদের দেহের মধ্যে। একদল অন্তর্মুখী, অর্থাৎ বাইরের সংঘাতের সাড়া ও চেতনা বহন ক'রে নিয়ে যায় তা'রা তা'দের প্রধান কর্ম্মস্থল মস্তিষ্কে; আর একদল বহির্মুখী, এদের কাজ—মস্তিষ্কে বাইরের সংঘাতে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার প্রেরণা বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ে। বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ—এই পাঁচটি আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়। মস্তিষ্ক থেকে সংঘাতের প্রতিক্রিয়াজনিত যে-নির্দ্দেশ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ে এসে পৌঁছায়, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি তৎক্ষণাৎ সেই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কাজ ক'রতে তৎপর হ'য়ে ওঠে। এইভাবেই আমরা কর্ম্মতৎপর হই। এই সাড়া-সংগ্রাহক (sensory) ও সাড়া-সঞ্চালক (motor) স্নায়ুরাজির সাহায্যেই আমাদের বোধ ও কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। আর, এই সমস্ত ক্রিয়ার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র মস্তিষ্ক। আমাদের সমগ্র চিন্তা, দর্শন, শ্রবণ, কর্ম্মধারা সবই নিয়ন্ত্রিত করে ঐ মস্তিষ্ক।

দেহের মধ্যে মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ, তাই তা'র আসন সর্ব্বোচ্চ-স্থানে। জীব-জগতেও দেখা যায়, যা'দের মস্তিষ্ক দেহের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, তা'রা বেশী বুদ্ধিমান্ প্রাণী। চতুষ্পদ প্রাণীদের মস্তিষ্ক দেহের উচ্চতার সাথে প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত। তাই, মনুষ্যের বুদ্ধির কাছে তা'দের পরাজয় স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে।

এই মস্তিষ্কের সামগ্রিক ক্রিয়া ও চেতনাশক্তি দিয়ে আমরা যে-ভাব বা আদর্শকে গ্রহণ ক'রে চ'লতে থাকি, আমাদের জীবনগতিও তেমনতর হ'য়ে ওঠে। মস্তিষ্কের কোষে-কোষে যখন যে-ভাবের রঙ্ ধ'রতে থাকে, আমরা তখন সেই ভাবে অনুরাগসম্পন্ন হ'য়ে উঠি। আর, মস্তিষ্কই যখন চিন্তা ও কর্ম্মের নিয়ন্ত্রক, তখন আমাদের কর্ম্মধারাও ঐ অনুরাগ-অনুযায়ীই চ'লতে থাকে। বোধবাহী ও কর্ম্মবাহী স্নায়ুগুলি সম-তালেই কাজ ক'রতে থাকে।

সেইজন্য, আমরা যা'কে ভালবাসি, তা'র জন্য করি, তা'কেই দিই, তা'রই কথা ভাবি, অপরের কাছে আবার তা'রই কথা গল্প করি। তা'র বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা ব'ললে সহ্য ক'রতে পারি না, সক্ষম হ'লে তা'র প্রতিবাদও করি। ভালবাসার মানুষটিকে

সব সময় কাছে পেতে ইচ্ছা হয়, তা'র কাছে থাকতে ইচ্ছা হয়, তা'র কথা শুনতে ইচ্ছা হয়। তা'র সাথে গল্প ক'রতে ব'সলে সময় কোথা দিয়ে চ'লে যায় টেরই পাই না। তা'র সাথে ক্ষণেকের বিচ্ছেদ সহ্য করাও কঠিন হ'য়ে পড়ে। আবার, বহুযুগও তা'র সঙ্গে কাটালে মনে হয় যেন সময়টা কত তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। তা'র সান্নিধ্য মনে কখনও ক্লান্তির সৃষ্টি করে না। আবার, তা'র কাজ ক'রেও কখনও পরিশ্রান্ত বোধ হয় না; বরং তৃপ্তিই আসে। অনেক ক'রেও মনে হয় কিছুই করা হ'ল না। এক কথায়, তা'কে সর্ব্বতোভাবে আপূরিত ক'রে জীবনের সার্থকতা বোধ হয়। এই-ই অনুরঞ্জনক্রিয়া, অনুরাগ বা প্রেম। সুষ্ঠু ও শিষ্ট জীবনলাভে এই প্রেম হওয়া চাই ইষ্টরস-সিঞ্চিত। আর, ইষ্ট তিনিই যিনি ধরার বুকে মূর্ত্ত কল্যাণরূপে আবির্ভূত।

তাহ'লে দেখা যা'চ্ছে, জীবনটাকে কোন ভাবে অনুরঞ্জিত ক'রতে হ'লে কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এটা ঠিক কাপড় রাঙ্গাবার মত ব্যাপার নয়, এর মধ্যে আছে কতকগুলি অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানগুলি আমরা মোটামুটিভাবে তিন-

ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগে হ'ল—প্রিয়তে অচ্যুতভাবে লেগে থাকা। বাইরের কোন সংঘাত, পরিবেশের কোন বিরূপ সমালোচনা, কপটাচারীদের কোনরকম বিদ্রূপ-কটাক্ষ ঐ লেগে-থাকাকে যেন একচুলও টলাতে না পারে। সমস্ত মনঃপ্রাণ ঐ ইষ্টভাবেই নিবিষ্ট ক'রে রাখা চাই। দ্বিতীয়তঃ, শুধু মনঃপ্রাণ সমর্পণ ক'রে জড়ের মত ব'সে থাকলে চ'লবে না। নিত্য কর্ম্ম করা চাই—ঐ প্রিয়ের তুষ্টিবিধানের জন্য। যেমনটি চ'ললে-ব'ললে-ক'রলে ঐ মনের মানুষটি খুশী হ'ন—প্রতিটি আচার-ব্যবহার, চাল-চলন তেমনতরই হওয়া চাই। তাঁ'র ভাল লাগা, তাঁ'র পছন্দটাই যেন নিজের কাছে প্রথম ও প্রধান করণীয় হ'য়ে ওঠে। আর, এইরকম হ'য়ে-ওঠার জন্য অন্তরে যে কর্ম্মসম্বেগের সৃষ্টি হয়, যে-আকুলতা জন্মে, সেটাই হ'ল অনুরাগ জন্মাবার তৃতীয় স্তর। যদিও এদের নাম প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় করা হ'ল, কিন্তু তা'র মানে এ নয় যে প্রথমটি আগে আসে, তা'রপরে আসে পরেরটি। তা' নয়। একটি হ'লেই অন্যগুলি সাথে-সাথেই আসে। এ যেন বিল্বপত্রের এক বোঁটায় তিনটি পাতা। কোন্‌টি যে আগে হ'য়েছে তা' বলা

যায় না। এদের নাম দেওয়া যেতে পারে প্রসঙ্গ-ক্রমানুযায়ী—নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতিসম্বেগ।

আমরা যা'-কিছু হ'তে চাই, পেতে চাই বা করতে চাই, প্রত্যেক জায়গাতেই লাগে এই ত্রিশক্তি-সম্মেলন। এই ত্রিশক্তির উপরেই গড়া প্রেমের সাম্রাজ্য, শিক্ষার সৌধ, ধর্ম্মের প্রাসাদ, বিজ্ঞানের নিকেতন। জীবনগঠনের মূলভিত্তি ঐ নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং কৃতিসম্বেগ। তিনটিই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত। মানুষ যখন কোন-কিছুতে অনুরক্ত হয়, সে অজ্ঞাত-সারেই এই ত্রিভিত্তিক রচনা-কৌশল নিয়ে চ'লতে থাকে। প্রেমের লক্ষ্য যে বা যা', তা'র ছাপ পড়ে মানুষের মস্তিষ্ককোষে। ফলে, তা'র দর্শন, শ্রবণ, মনন, কর্ম্মপদ্ধতিতে তদনুযায়ী ক্রিয়াই সঞ্চারিত হ'তে থাকে। মস্তিষ্কের চিন্তাকেন্দ্রে ছাপটা পড়ার দরুণ দেহের প্রতিটি গতি-সঞ্চালক স্নায়ু ঐ ছাপ-অনুপাতিকই সাড়া-সঞ্চালন ক'রতে থাকে প্রতিটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে। আচার-আচরণে ক্রমশঃই ফুটে উঠতে থাকে তা'। এইভাবে অনুরাগের বাহ্যপ্রকাশ দেখা যায়, দেখা যায় নিষ্ঠার উজ্জ্বল সাবলীলতা।

সপ্তম অধ্যায়

সদ্‌গুরু

যে-প্রেমে কোন কামনা-বাসনা থাকে না, স্বার্থবুদ্ধি থাকে না, সেই প্রেমই স্থায়িত্ব লাভ ক'রে থাকে। স্বার্থ-প্রত্যাশাবিহীন ভালবাসাই জয়যুক্ত হয়। সেখানে শুধু স্বার্থ থাকে—প্রিয়ের তুষ্টি, পুষ্টি ও স্বস্তিবিধান।

যদি কল্যাণের অধিকারী হ'তে চাই, সপারিপার্শ্বিক যদি মঙ্গলের পূজারী হ'তে চাই, তবে মস্তিষ্ককেন্দ্রে দিতে হবে কল্যাণেরই অনুলিখন। মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষই যেন ঐ লেখা বা রেখায় অঙ্কিত হয়। আর, সে কল্যাণ-লিখনের মূর্ত্ত উৎসই হ'চ্ছেন—জীবন্ত ইষ্ট বা সদ্‌গুরু। সৎকথা, সৎচিন্তা, সৎকর্ম্ম—সব-কিছুই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ঐ মানুষটির মধ্যে। তাঁকে ভাল-বাসলে তাঁ'র প্রেরণা ও সম্বেগ আমাদের মধ্যে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। তাঁকেই বলা হয়—ইষ্ট, গুরু, আদর্শ, প্রিয়পরম।

ইষ্টকে চিনবার প্রধান লক্ষণই হ'ল—তিনি প্রতি-প্রত্যেককে তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পালন-পোষণ ক'রে চলেন। তাঁ'র কাছে এসে কা'রো স্বীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। বরং যে-যে গুণে মানুষ বিশেষিত হ'য়েই

আছে, তা'র সেই-সেই গুণগুলি আরো উচ্ছল, আরো শিষ্ট, আরো উজ্জ্বল, আরো তৎপর হ'য়ে ওঠে। আর, যা'তে তা' হ'য়ে ওঠে, ইষ্ট সেইভাবেই পরিপোষণ দান করেন। ইষ্টসান্নিধ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা ও বৈশিষ্ট্যই স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে। মানুষ স্বস্তির অধিকারী হয়। ইষ্টের বা সদ্‌গুরুর আরো একটি বড় লক্ষণ—তিনি প্রতিপ্রত্যেককে সর্ব্বতোভাবে আপূরিত ক'রতে পারেন। কী মানুষ, কী জীবজগৎ, কী গাছপালা—সবাইকে এবং সব-কিছুকেই তিনি তা'দের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিপূরিত ক'রে চলেন।

সদ্‌গুরুর জীবন ও বাণীর মধ্যে দু'টি জিনিষ খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়—একটি নিরন্তর চলমানতা এবং অপরটি সুকেন্দ্রিকতা। সদ্‌গুরুর অনুধ্যান ও উপাসনা ক'রে কিছু ফুরিয়ে গেল বা শেষ হ'য়ে গেল কোন একটা জায়গায়—তা' মনেই হয় না। সেখানে আছে নিত্য যোগযুক্ত অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মধারা। কিন্তু এই কর্ম্মপ্রবাহ কখনও কেন্দ্রহারা হ'য়ে পড়ে না। কেন্দ্রে স্থির ও অচঞ্চল থেকেই ইষ্টদেব নিয়ত সবাইকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। তাই, সদ্‌গুরুর কাছে এসে মানুষ ক্ষ'য়ে যায় না, হীন হয় না, অসম্পূর্ণ

থাকে না। তা'র জীবন চলে ক্রমবর্দ্ধনার পথে—পরিপূর্ণ বিমল আনন্দের উপভোগমাধুর্য্যে।

আমাদের বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-দর্শন সবই এই গুরু-ভক্তির গানে মুখরিত। আর্য্যঋষিগণ বুঝেছিলেন যে, মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা—অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত দরদী ব্যক্তিত্বের প্রতি তীব্র অনুরাগযুক্ত চলনে। তাই, তাঁ'দের কথায়-লেখায় সেই সুর প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে। বাস্তব জগৎকে তাঁ'রা অস্বীকার করেননি। কিন্তু দেখেছেন, এই দৈনন্দিন জগতেও সর্ব্বতোমুখী কৃতিত্ব-লাভের জন্য জীবন-প্রভাতে ইষ্টনির্দ্দেশে অভিষিক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আগে গুরুর কাছে উপনীত হও, তাঁ'তে নিষ্ঠা অটুট হো'ক, তা'রপর তুমি এগিয়ে চল গার্হস্থ্যাশ্রমে, ছড়িয়ে পড় শিক্ষাক্ষেত্রে,, সমাজ-গঠনে, রাজনীতিতে, দেশরক্ষায়—যেখানে খুশী। আর ভয় নাই। গুরুর রক্ষাকবচ আঁটা র'য়েছে দেহে। যদি কোথাও সমস্যা আসে, সংসারের কুটিল আবর্ত্তে প'ড়ে যদি কখনও ভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, ঐ ইষ্টনিষ্ঠার আলোকই তোমাকে পথ দেখাবে। তাই, আর্য্যঋষি জীবনের প্রথম ভাগেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরু-কেন্দ্রিক জীবনের বিধান দিয়েছেন। ঐখানে গুরুর

কাছে সমাবর্ত্তন পেলে মানুষের বৃহত্তর সামাজিক জীবন সুরু হ'ত।

অষ্টম অধ্যায়

পিতামাতার সেবা

এই যে ইষ্টপ্রীতিসিক্ত মহাজীবন, মানুষ প্রথমেই এটা লাভ ক'রতে পারে না। কারণ, জন্মের পরেই সে ইষ্টকে পায় না। সে পায় অসীম স্নেহবিগলিতা তা'র কল্যাণময়ী জননীকে। মা-ই মানুষের প্রথম পরিবেশ। মাতৃস্তন্যে মায়ের কোলে সে বড় হয়। এই সময়েই আর-একজনের স্নেহ ও সোহাগ তা'কে লালিত করে, তিনি হ'চ্ছেন পিতা। জন্মের পরে শিশু প্রথম চেনে মা-বাবাকে। সেই পিতামাতার উপরে যা'দের নিষ্ঠাভক্তি অটুট থাকে, তাঁ'দের সেবা ও জীবনচর্য্যার দায়িত্বগ্রহণ যা'র কাছে স্বতঃ, সহজ ও স্বাভাবিক, ভবিষ্যজীবনে তা'রই পক্ষে ভক্তিমুখর ইষ্টময় জীবন লাভ করা সম্ভব। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির বেদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েই ক'রতে হয় ইষ্ট-

আরাধনা। পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে, তাঁদের জীবন-পালনের দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে চ'ললে ইষ্টের আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায় না। তাই, আমাদের শাস্ত্র ব'লেছেন—

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥" ২৫ ॥
(৮ম উল্লাস, মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

গৃহস্থাশ্রমী মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতারূপে প্রতিনিয়ত প্রযত্ন-সহকারে সেবা ক'রবেন। আবার, মহাভারতে যক্ষ যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন ক'রলেন— পৃথিবীর থেকে গুরুতরা (ভারী) কী? আকাশ থেকেও উচ্চতর কী? উত্তরে যুধিষ্ঠির ব'ললেন—

"মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥" ৫৪ ॥
(২৬৭তম অধ্যায়, বনপর্ব্ব)

পৃথিবী থেকেও গুরুতরা মাতা, আকাশ থেকেও উচ্চতর পিতা। উত্তর শুনে যক্ষ সন্তুষ্ট হ'লেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে একবার কপিলাবস্তুর সন্নিকটে এসে ভগবান্ বুদ্ধদেব শুনলেন, পিতা শুদ্ধোদন তাঁ'র সাথে দেখা ক'রবার জন্য আকুল আগ্রহ নিয়ে ব'সে আছেন। শুনেই প্রাণের উৎসাহে বন্ধুকে ব'ললেন বুদ্ধদেব—

"যাবো বৈ কি! নিশ্চয়ই যাবো। এ যে আমার কর্ত্তব্য। তোমরা না এলেও আমি যেতাম। তুমি আগে যাও, শীঘ্রই আমি সেখানে পৌছাব।"

(গৌতম বুদ্ধ, ৯ম পরিচ্ছেদ)

কী দেখা যাচ্ছে এখানে? সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ভগবান্ বুদ্ধদেব ব'ললেন, পিতৃসন্দর্শন তাঁ'র কর্ত্তব্য। কেউ ডাকতে না এলেও তিনি নিজেই সেখানে যেতেন। ইষ্টলাভ তাঁ'র হ'য়েছে। কিন্তু তাঁ'র জীবনের প্রথম বেদীকে তিনি বিস্মৃত হ'তে পারেননি। জননী নেই। কিন্তু জনকের প্রাণে সান্ত্বনাদান তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন এখনও। আবার, ভক্তগণের সাথে কথাপ্রসঙ্গে ব'লছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—

"মা কি কম জিনিষ গা?........বৃন্দাবনে গিয়ে আমার আর ফিরে আসতে ইচ্ছা হ'ল না।........এমন সময় মাকে মনে প'ড়লো। অমনি সব বদ্‌লে গেল। মা বুড়ো হ'য়েছেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)

রামকৃষ্ণ ঠাকুর আজ বিশ্বের দরবারে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে পূজিত। তাঁ'রও জীবনে কী অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি! আর, তা'ই নিয়েই ভগবান্ হ'য়েছেন তিনি।

এই মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তিই হ'ল সব উন্নতির [illegible] কিন্তু ভক্তি শুধু মুখের কথায় হয় না। ভক্তির মধ্যে আছে—ভজন, সেবা, দান, অনুরাগ, অনুশীলন। ভক্তি, ভালবাসা—এগুলি বড় সক্রিয়, বড় কর্ম্মতৎপর। এ-সবের মধ্যে আছে নিত্য অনুশীলন, হাতেকলমে কিছু করা। যেখানে ভক্তি শুধু মুখে-মুখে দেখানো হয়, কাজে ফোটে না; ভক্তির পাত্রের একটু সেবা করার জন্য প্রাণটা আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে না, সে-ভক্তি সন্দেহের। যে-সন্তানকে পিতামাতা বহু কষ্টে মানুষ ক'রে তুলেছেন, তা'কে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সংসারে তা'কে চ'লবার উপযোগী ক'রে দিয়েছেন, পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বাভাবিক-ভাবেই বর্ত্তায় সে-সন্তানের উপর। পিতামাতার ভরণ-পোষণ না-করা সন্তানের পক্ষে মহাপাপ। এ-প্রসঙ্গে মহাভারতে বিশেষ ক'রে বলা আছে—

"ভৃতো বৃদ্ধো যো ন বিভর্ত্তি পুত্রঃ
স্বযোনিজঃ পিতরং মাতরঞ্চ।
তদ্বৈ পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
তস্মান্নান্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে॥" ৩১ ॥

(১০৫তম অধ্যায়, শান্তিপর্ব্ব)

অর্থাৎ স্বীয় পিতামাতা কর্তৃক পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে যে-পুত্র ঐ পিতামাতাকে ভরণপোষণ না করে তা'র পাপ ভ্রূণহত্যার পাপের সমতুল। ঐ সন্তানের থেকে বড় পাপকারী আর পৃথিবীতে নেই।—তাহ'লে পিতামাতার ভরণপোষণ না করা কত বড় পাপ!

পিতামাতার প্রতি ভক্তিবিনম্র সেবার দ্বারা মানুষ ঐ পাপ থেকে মুক্ত হ'তে পারে। সে-সেবার মধ্যে আছে—নিত্য পিতামাতার পাদবন্দনা, তাঁ'দের অনুগমন, তাঁ'রা যা'তে খুশী হন সেইভাবে চলা, তাঁ'দের স্বার্থরক্ষা করা, ভরণপোষণ করা, নিত্য তাঁ'দের বাস্তবে কিছু-না-কিছু অর্ঘ্যপ্রদান করা। এই সেবার ভিতর-দিয়ে পিতামাতা তৃপ্ত হ'ন, সন্তান তা'র জীবন সফল মনে করে। শ্রেষ্ঠের জন্য এই যে নিত্য করণীয়, নিত্য বাস্তবে তাঁ'দের অর্ঘ্যদান, এটাই যজ্ঞ নামে অভিহিত। 'যজ্ঞ' মানেই যজনক্রিয়া, দান, পূজা, সঙ্গতিকরণ। আর, এসবগুলিই প্রতিনিয়ত নিষ্ঠাভরে অনুশীলন ক'রে চলা চাই। যজ্ঞ তখনই সার্থক হ'য়ে ওঠে।

যজ্ঞের উদ্দেশ্যই হ'ল শ্রেয়জীবনলাভ। নিত্য বাহ্যিক ও মানসিক অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে যিনি উন্নততর জীবনের পথিক হ'য়ে এগিয়ে চ'লেছেন,

তিনিই যথার্থ যজ্ঞকারী। যজ্ঞের মর্ম্ম তিনিই অনু-ধাবন ক'রেছেন। তাঁ'রই আশ্রয়ে যজ্ঞও সুসম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে। মানুষ বুঝতে পারে যজ্ঞ কী, কী তা'র তাৎপর্য্য! বৈদিক যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠানের ভিতরও দেখা যায় ঐ শ্রেয়পন্থালাভের ইঙ্গিত। সেখানে যজনীয় ও যজমানের ভিতরে একটা গভীর সম্বন্ধের স্থাপনা দেখা যায়। যজমানের ভক্তিভরে হবিঃ-প্রদানে তুষ্ট হ'চ্ছেন যজনীয়। যজমানের জীবনচলনার ক্ষেত্রে অহরহ প্রয়োজনীয় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে যজনীয়ের সাহায্য ও সহযোগিতা। তাঁ'র আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ অনুশাসনবাদ যজমানের চলার পথের নির্দ্দেশ-আলোক। তা'রপর, তাঁ'রই প্রসাদে যজমান লাভ ক'রছেন পুত্র, পশু, বিত্ত। এই যে প্রাপ্তি, এ-যেন যজনীয় দেবতার হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত স্নেহ-অবদান। যজমানেরও কোন প্রত্যাশা নেই এ-ব্যাপারে। তিনিও জানেন, দেবতার তুষ্টিবিধানই তাঁ'র লক্ষ্য। যে 'দেহি' 'দেহি' রব বেদমন্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, সে-চাহিদা আত্মভোগ-সুখের জন্য নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ-পরিপূরণের জন্যও নয়। ঋষি সে-সব চেয়েছেন—তাঁ'র জীবনটাকে সপারিপার্শ্বিক ক্রমবর্দ্ধনায় উচ্ছল ক'রে তুলতে। তাঁ'র সে-প্রাপ্তি

এমনতরই হওয়া চাই, যা'তে জগতের কল্যাণ হয়।

উদাহরণস্বরূপ একটি মন্ত্র দেখা যা'ক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে অগ্নিদেবতার সূক্তে মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রার্থনা ক'রছেন—

"অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ
পোষমেব দিবে দিবে
যশসং বীরবত্তমম্।"

(ঋগ্বেদ, ১।১।৩)

অগ্নি আমাদের ধন দান করুন। কেমন ধন? যা' নাকি প্রতিদিনই পরিপুষ্ট হ'তে-হ'তে চ'লবে। আরো কেমন?—সেই ধন হবে 'যশস্য' অর্থাৎ যশবিধান-কারী, এবং শ্রেষ্ঠ-বীরপুরুষোপেত, বীরত্বশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ শৌর্য্যশালী। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, আজকের ধন যেমন অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা, অনেক বিপত্তি আনে, ঋষি তেমনতর ধন চাইছেন না। ঐ ধনে তাঁ'র যশ বৃদ্ধি হওয়া চাই। আর, যশ আসতে পারে তখনই, যখন মানুষ বহুর মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে (যশ্>অশ্ ধাতু = ব্যাপ্তি), বহুজনের মনের মানুষ, আপনার লোক, মাথার মুকুট হ'য়ে ওঠে। আর, তা' হ'তে পারে এক-

মাত্র তখনই যখন মানুষ বহুলোকের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হয়, তা'দের আপদ্-বিপদ্, দুঃখ-কষ্ট নিজের ব'লে বোধ ক'রে তা'র নিরাকরণ সাধন ক'রে তা'দের সমৃদ্ধি-সাধনে তৎপর হ'য়ে ওঠে। আবার, যে-ধন ক্লীব ক'রে দেয় মানুষকে, ভীরু ক'রে দেয়, ঋষি সে-ধনের প্রত্যাশী ন'ন। তিনি চান তেমনতর সম্পদ্, যা' মানুষকে বীর ক'রে তোলে, সৎকার্য্য-সম্পাদনে সাহসী, বীর্য্যবান্, তেজস্বী ক'রে তোলে, অসতের বিরুদ্ধে পরাক্রমী শৌর্য্য নিয়ে দাঁড়াতে অকম্পিতপ্রাণ ক'রে তোলে।

এইতো যজ্ঞ। এইতো যজনক্রিয়া। শ্রেষ্ঠকে অর্ঘ্য-প্রদানের এইতো মহিমময় পুরস্কার।

নবম অধ্যায়

শিক্ষাভূমি

অগ্নি-শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য ব'লেছেন—যজ্ঞে প্রথমে যাঁ'কে প্রণয়ন করা হয়, তিনিই অগ্নি, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের প্রথমে যাঁ'র পরিচর্য্যা। বৈদিক যজ্ঞবিধিতে তিন প্রকার অগ্নির কথা বলা আছে—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি।

যাগক্রিয়ায় এই তিন প্রকার অগ্নির প্রয়োজন অপরিহার্য্য। মনুসংহিতায় আমরা দেখি—পিতাকে তুলনা করা হ'য়েছে গার্হপত্য-অগ্নির সাথে; মাতা তুলিত হ'য়েছেন দক্ষিণাগ্নির সঙ্গে, আর আচার্য্যকে বলা হ'য়েছে আহবনীয়-অগ্নি (২য় অধ্যায়, ২৩১তম শ্লোক)। এই তিন অগ্নিই জগতে গরীয়ান্। জীবগঠনের পক্ষেও তেমনি এই তিনের সম্মিলিত প্রয়োজন অপরিহার্য্য। পিতামাতা আমাদের এই শরীরের জন্মদান করেন; আর গুরু করেন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্মদান; তখন মানুষ দ্বিজত্বলাভ করে।

ভগবান্ মনু আরো ব'লেছেন—

"পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।" ২২৬।

(২য় অধ্যায়)

পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, এবং

"মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু।" ২২৬।

(২য় অধ্যায়)

মাতা ধরিত্রীর মূর্ত্তি। দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের বিধানশাস্ত্র স্মৃতিসংহিতায় পিতামাতাকে বৈদিক হোমাগ্নির সাথে উপমিত ক'রে কত বড় আসন দান করা হ'য়েছে। পিতামাতা প্রথম গুরু। তাঁ'দেরই দয়ায় ইহলোকে

আমাদের চেতনার দ্বার উন্মুক্ত হ'য়েছে। তাঁদেরই প্রসাদে এই আলো-বাতাস-হাসি-গান-ভরা সুন্দর জগতের স্বাদ আমরা পাচ্ছি। তাই, তাঁ'দের সেবা-পূজার ভিতর-দিয়েই জীবনের প্রথম শিক্ষার সোপান সুরু হয়।

আবার, শিক্ষার মধ্যে আছে—শক্তি, সামর্থ্য, সাহায্যকরণ। কারণ, শিক্ষ্-ধাতু মূলতঃ শক্-ধাতু থেকে উৎপন্ন (দ্রঃ ডব্লিউ, ডি, হুইট্‌নি-কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ)। শক্-ধাতুর মধ্যে উপরি-উক্ত অর্থগুলি বিদ্যমান। প্রকৃত শিক্ষার সাফল্যই হ'ল—এই সামর্থ্য বা যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে অপরের ভিতরেও ঐ সামর্থ্য বা যোগ্যতা সঞ্চার করা। প্রকৃত শিক্ষা জীবনকে কখনও স্তিমিত বা ক্লীব ক'রে দেয় না। তা' জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোলে চরিত্রে, যোগ্যতায়, মহত্ত্বে, শিষ্টতায়। শিক্ষণীয় বিষয় নিত্য আবৃত্তি, অভ্যাস ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে শিক্ষার্থীর চরিত্রে স্থিতি লাভ ক'রে তা'কে সুকর্ম্মতৎপর ক'রে তোলে, তা'র অন্তর-জগতে চেতনার এক মহাজাগরণ ঘটায়।

'আবৃত্তি' কথার মানেও আ-বৃৎ—সর্ব্বতোভাবে

কোন বিষয়ে অবস্থান করা, বর্ত্তমান থাকা। যা' শিখছি, তদ্বিষয়ক ভাবরাজ্যে বা চিন্তারাজ্যে যখন আমরা বিচরণ ক'রতে থাকি, আমাদের চিন্তা-ভাবনা যখন ওরই প্রসঙ্গে চ'লতে থাকে, তখনই হয় সত্যিকারের 'আবৃত্তি'। নতুবা, একটা জিনিষ শুধু বার-বার প'ড়ে গেলেই আবৃত্তি হয় না। আর, শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ আবৃত্তির অপরিহার্য্য প্রয়োজন। এরই সাথে আছে অভ্যাস। অভ্যাসের মধ্যে আমরা পাচ্ছি 'অভি' অর্থাৎ অভিমুখে, 'আস্' মানে থাকা। অভিমুখে থাকা। কিসের অভিমুখে? যা' আমরা আয়ত্ত ক'রতে চাই তা'রই অভিমুখে যখন আমরা চিন্তাচলন অভিনিবিষ্ট ক'রে চ'লতে থাকি, তখনই হয় 'অভি-আস্' বা অভিমুখে থাকা। আর, এইভাবে অধিগমনের অভিমুখে এগিয়ে যেতে-যেতেই আসে জ্ঞান।

"সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ ॥" ১৭ ॥

(শিবসংহিতা, ৪র্থ পটল)

অর্থাৎ অভ্যাসের ভিতর-দিয়েই আসে সম্যক্ জ্ঞান।

কিন্তু জীবনের কোন পথই কুসুমপেলব নয়। প্রতিক্ষেত্রেই আছে বাধা, নানারকম সংঘাত। এগুলিকে জয় ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রের ইতি-

হ্রাসও তা'ই। বহুরকমের অসুবিধা আছেই, যেগুলি সব সময় পথ থেকে ছিট্‌কে ফেলে দিতে চায়। তাই, এই যাত্রাপথে চাই একটি দৃঢ় অবলম্বন। সে-অবলম্বন—একনিষ্ঠ শ্রেয়শ্রদ্ধা।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥" ৩৯ ॥

(গীতা, ৪র্থ অধ্যায়)

—তৎপর এবং ইন্দ্রিয়সংযমী শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই জ্ঞান লাভ ক'রে থাকে। শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেই মানুষ শেখে। কারণ, শ্রদ্ধা মানুষকে একমুখী সেবা-তৎপর ক'রে তোলে। সমস্ত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের মূলসূত্র ওখানে। আগে আমরা দেখেছি, মানুষের জীবনকেন্দ্র যেমনতর, তা'র জীবনগতিও তেমনি হয়। এখানেও ঠিক তাই। মানুষ যা'কে ভালবাসে, যা'র প্রতি সে শ্রদ্ধাবান্, তা'র চলার ধাঁজও ঠিক সেই জাতীয় হ'য়ে ওঠে, প্রাপ্তি ও অধিগতিও সেইরকম হয়।

"যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥" ৬৮ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অর্থাৎ শ্রদ্ধা যেমন, সিদ্ধিও তেমনি হয়।

তাই, প্রয়োজন—শ্রেয়শ্রদ্ধা; শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণ-পুরুষ, তাঁ'কেই আশ্রয়পূর্ব্বক সেবার ভিতর-দিয়ে

তাঁ'কেই ধারণ করা। আর, তা' হওয়া চাই একনিষ্ঠ। নিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষে (তদ্ভাবে) স্থিতি, যেন এক-লহমার জন্যও টলে না যায়। আমাদের জীবন-উৎস যিনি—সেই পরমেশ্বর, পরম দয়াল, তিনিও নিষ্ঠাময়। সমস্ত বিশ্বে তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে রেখেছেন। বিশ্বময় তাঁ'রই নিত্য স্থিতি। তাঁ'রই সন্তান আমরা। তাই, আমাদের মধ্যেও সে-নিষ্ঠা অন্তঃস্যূত হ'য়েই র'য়েছে। অচ্যুত এককেন্দ্রিক চলায় সেই নিষ্ঠার বিপুল জাগরণ ঘটে আমাদের অন্তরে। ঐ নিষ্ঠাই জীবনের মেরুদণ্ড। নিষ্ঠাই পরম অবলম্বন। নিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ অধিষ্টিতি। নিষ্ঠা-ব্যতীত কোন কাজে পূর্ণ সিদ্ধি আসে না।

দশম অধ্যায়

দানপ্রশংসা

পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম অবিচলিত নিষ্ঠাপ্রাণ সেবার ভিতর-দিয়ে জীবনবর্দ্ধনার প্রথম দ্বার উন্মুক্ত হয়। পূর্ব্বেই ব'লেছি, এই সেবা হওয়া চাই বাস্তবে, হাতেকলমে। তাঁ'দের জন্য বাস্তবে কিছু করাই বাড়িয়ে

দেয় তাঁ'দের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা। তাই, পিতামাতার সেবা গৃহস্থের অন্যতম নিত্য করণীয় ব'লে বিহিত আছে আমাদের শাস্ত্রে। বেদবিধানেও নিত্য অগ্নি-প্রজ্বালন এবং অগ্নিতে হবিঃপ্রদানের কথা আছে। পিতামাতাই গৃহের সাক্ষাৎ অগ্নি। তাঁ'দেরও নিত্য বাস্তবে অর্ঘ্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। করাই ভালবাসাকে বাড়িয়ে তোলে। যা'র জন্য আমরা করি, তা'র 'পরেই টান হয় আমাদের। মা সন্তানের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন, তাই তো সন্তানের উপর তাঁ'র নাড়ী-ছেঁড়া টান। দূরস্থ সন্তান বিপদে প'ড়লেও মায়ের প্রাণ তা' যেন বুঝতে পারে। কারণ, তিনি তা'কে বুকের রক্ত দিয়ে গ'ড়ে তুলেছেন।

একটা পাখীকেও যখন আমরা পুষি, পালন করি, হাতে ক'রে খাওয়াই, তা'র অসুখের জন্য ওষুধ দিই, তখন তা'র উপরেও আমাদের টান হয়। অনেকের দেখা যায়, গাছপালার উপরেও কেমন যেন সন্তানস্নেহ। নিজের হাতে ক'রে বীজ থেকে যে-গাছ তিনি বড় ক'রেছেন, তা'র একটি পাতা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেও তাঁ'র প্রাণে ব্যথা লাগে। তৎক্ষণাৎ তিনি তা'র নিরাকরণে যত্নবান্ হন। আবার, অসৎ-দিকেও

ভালবাসার এই একই তুক। বারবণিতা চিন্তামণির জন্য ধনীর দুলাল বিল্বমঙ্গলের কি করার অন্ত ছিল? কোন করাই তা'র কাছে যথেষ্ট মনে হ'ত না। তা'র চিন্তা, তা'রই আলাপন, তা'রই জন্য করা ছিল বিল্বমঙ্গলের একমাত্র ধ্যান। কেন? কারণ, ঐ টান। ক'রতে-ক'রতেই টান গজায়। আবার, টান ধ'রে গেলে করাটা তখন হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সহজ। তখন, দিয়েই তৃপ্তি আসে। প্রিয়ের তরে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও মন আনন্দে ভরপুর হ'য়ে থাকে।

বাস্তব দানের ভিতর-দিয়েই হয় সত্যিকারের আনন্দ, আত্মতৃপ্তি।

"উপভোগাংস্তু দানেন ॥" ১০ ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৬শ অধ্যায়)

দানের ভিতর-দিয়েই প্রকৃত উপভোগ আসে। এ উপভোগের স্বরূপ ভাষায় সবটুকু ব্যক্ত করা যায় না। যে করে, সে-ই বোঝে। চিনি কেমন মিষ্টি, তা' খেয়ে বুঝতে হয়। এই দানধর্ম্মের উচ্ছল প্রশংসা আছে মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে। শ্রেয়ার্থে দান মানুষকে কতখানি মহিমময় ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলে, তা' বহু অধ্যায় ধ'রে সেখানে বিবৃত র'য়েছে। দানের

ভিতর-দিয়ে শ্রেয়লাভের কথা সেখানে পুনঃ-পুনঃ বিঘোষিত হ'য়েছে। এই দানযজ্ঞের প্রথম হাতেখড়ি হয় পিতামাতাকে অর্ঘ্যদানের ভিতর-দিয়ে। তাঁ'দের দেওয়ার অভ্যাস আরো বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের কল্যাণার্থে দানের চেতনা উচ্ছল ক'রে তোলে। ধর্ম্মব্যাধ এই-ভাবেই মহীয়ান্ হ'য়ে উঠেছিলেন। উপনিষদের বাণী —দান ক'রতে হবে শ্রদ্ধার সাথে, সম্মানপূর্ব্বক, সম্বিৎ-সহকারে ইত্যাদি রকমে। এমনতর দানই মানুষকে মহতী চেতনার পথে নিয়ে যায়।

শাস্ত্রে আছে, দ্বিজাতিমাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান নিত্য কর্ত্তব্য।

"দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানম্।"

(গৌতমসংহিতা, ১০ম অধ্যায়)

অধ্যয়ন অর্থাৎ নিত্য বেদপাঠ, যজ্ঞ ব'লতে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ এবং দান মানে লোককল্যাণার্থে সেবাদান বুঝতে হবে। এ সবগুলিই শ্রেয়জীবনলাভের উপায়। গৃহদেবতারূপী পিতামাতাকে নিত্য বাস্তব অর্ঘ্যদানের ভিতর-দিয়ে যে-বীজ উপ্ত হ'য়েছিল, ক্রমে-ক্রমে তা' ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর পরিবেশে। পঞ্চমহাযজ্ঞ তা'রই বহিঃপ্রকাশ।

মানুষের জীবন তো শুধু চার দেওয়ালে বেষ্টিত ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সে সামাজিক জীব। সমাজ নিয়েই তা'কে চ'লতে হয়। সে বহুর একজন। এই দুনিয়ায় এককভাবে কেউ বাঁচতে পারে না। তাই, বহুর সুখদুঃখের সাথে তা'র সুখদুঃখ জড়িত। সমাজ ও পরিবেশের অভাব-অসুবিধা তা'কেও ভোগ ক'রতে হয়। সেজন্য, সকলের সাথেই রাখতে হয় তা'র ভাবের আদান-প্রদান, কর্ম্মের আদান-প্রদান। এই দান-প্রতিগ্রহের নিত্য অনুষ্ঠানে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যোগ নিবিড় হয়। একে অন্যকে বোধ ক'রতে পারে। মৈত্রী ও সংহতির পথ প্রশস্ত হয়।

একাদশ অধ্যায়

পঞ্চমহাযজ্ঞ

বাঁচতে হ'লে নিত্য আহার গ্রহণ ক'রতে হয় মানুষকে। প্রত্যেকেই প্রতিদিনই খায়। বিজ্ঞানদৃষ্টি আর্য্যঋষির কাছে এই খাওয়াটা বিশেষভাবে ধরা প'ড়েছিল। তাই, আহার-সম্বন্ধে তাঁ'দের বহুরকম বিধান র'য়েছে। কেমন খাদ্য ভাল, কেমন খাদ্যে অবসা

আসে, কা'র-কা'র হাতে খাওয়া যায়, কখন খাওয়া উচিত, কিভাবে খেতে হয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁ'দের কথা অতি বিশদভাবে বিবৃত র'য়েছে। সাথে-সাথে তাঁ'রা আরো একটা ব্যাপারের উপরেও বিশেষ জোর দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিককে তাঁ'রা অবজ্ঞা করেননি। তুমি বাঁচ, কিন্তু সেই সাথে তোমার পারিপার্শ্বিককেও বাঁচাও। এই তাঁ'দের কথা। তুমি খাও, কিন্তু সবাইকে খাইয়ে তা'রপর খাও। স্বার্থপরের মত একা খেও না।

সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে চ'লে আসছে এই সুমহান্ প্রথা। বেদসাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, 'হুতশেষ' অর্থাৎ আহুতি-প্রদানানন্তর দানপাত্রে অবশিষ্ট অংশ ভোজন করা—পরম শ্রেয়, উৎকর্ষবিধায়ক, আয়ুবর্দ্ধক, কল্যাণকর। কেন? আগে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ নিবেদিত হ'চ্ছে। আর, দ্যুতিমান্ চরিত্র ও জীবন যাঁ'দের, তাঁ'রাই দেবতা। তাঁ'দের সৎনিষ্ঠানন্দিত সাধু-শিষ্ট জীবন মানুষের আশা ও ভরসার স্থল। প্রথমে তাঁ'দিগকে অর্ঘ্য প্রদান ক'রে তা'রপর তাঁ'দেরই প্রসাদস্বরূপ অবশিষ্ট অন্নাংশ অর্থাৎ ভক্ষ্যাংশ (অদ্‌ধাতু = ভক্ষণ) আমি গ্রহণ ক'রছি। উদ্দেশ্য—প্রথমে তাঁ'দেরই স্মরণ-মনন। আর, সেই

স্মরণ-মননের ভিতর-দিয়ে যে-আহার্য্য আমি আমার শরীরের পুষ্টির জন্য গ্রহণ ক'রছি, তা'র ভিতর-দিয়ে যেন তাঁ'দেরই তেজ সঞ্চারিত হ'চ্ছে। তাঁ'দের জ্যোতিতে আমি আবিষ্ট হ'চ্ছি। আর, সেই তেজে আমার শরীর পুষ্ট হ'য়ে উঠুক, আমি যেন তাঁ'দেরই মত দিব্য চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারি। আমার জন্ম দিব্য হো'ক, কর্ম্মও দিব্য হ'য়ে উঠুক।

সেই বৈদিক যুগ হ'তেই এই নিত্য অর্ঘ্যদানের বিধান চ'লে আসছে। গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, স্মৃতিসংহিতা, মহাকাব্য প্রভৃতি সব কিছুতেই র'য়েছে এই শিষ্ট অনুশাসন। প্রতি জায়গা থেকে অসংখ্য উদাহরণ তুলে দেখাতে গেলে গ্রন্থকলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং পুনরুক্তি দোষ ব'লে মনে হবে। তাই, সবটা আলোচনা না ক'রে কিছুটা অংশ বিচার ক'রে আমরা দেখছি—পারিপার্শ্বিককে সম্বর্দ্ধিত করার কথা কত উচ্চ ও সুন্দরভাবে সর্ব্বত্র র'য়েছে।

মনুসংহিতায় আছে—

"দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥ ১১৭ ॥

Satsang - Intobhriti Mohajoggo

লোকের অক্লান্ত নিখুঁত চেষ্টার ফলে আমি হয়তো একখানা প্রথম শ্রেণীর শান্তিপুরী ধুতি প'রতে পাই। এইরকম খাওয়া-বেড়ানো-ঘুমানো সব-কিছুতেই আমরা প্রতিনিয়ত অজস্র মানুষের কাছে ঋণী হ'য়ে চ'লেছি। প্রত্যেকেই আমার জন্য শ্রম ক'রেছেন। এমন-কি, কাক-শকুন-শিয়াল প্রভৃতি পশুপাখীও আমাদের অশেষ উপকার সাধন করে। এরা প্রকৃতির মেথর। যত ময়লা, আবর্জ্জনা, শব, এরাই পরিষ্কার ক'রে দেয়। এরা না থাকলে পৃথিবীর হাওয়া বিষাক্ত, দুর্গন্ধময় হ'য়ে উঠত। এই যে পারিপার্শ্বিক, এদের প্রত্যেকের জন্যই আমার করণীয় আছে। এদের সেবা ক'রতে হবে, ভালবাসতে হবে। সে-ভালবাসার মূল্য নির্ণয় ক'রে দিয়েছেন ভগবান্ যীশুখ্রীষ্ট—

"You must love your neighbour as yourself." (St. Mark, Chap. 12, Verse 31.) —তোমাদের পারিপার্শ্বিককে তোমরা নিজের মত ক'রে ভালবাসবে। কত বড় কথা! শুধু মৌখিক ভালবাসা নয়। তা'দের অভাব-অভিযোগ, আনন্দ-দুঃখকেও নিজের মত ক'রে ভাবতে হবে। প্রকৃত ভালবাসা এখানে। আর, ভালবাসা থাকলেই সেখানে থাকে—

দেওয়া-নেওয়া, খাওয়া-খাওয়ানো। এরই বাস্তব ও ব্যাপক রূপ—পঞ্চমহাযজ্ঞ।

এই পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান পরবর্ত্তীকালের স্মৃতির বিধান নয়। আদিবেদ ঋক্‌সংহিতাতে বীজাকারে পাওয়া যায় ঐ যজ্ঞের কথা। দানের উচ্ছল প্রশংসার সাথে সেখানে অদাতার এবং স্বার্থপরের মত সবাইকে বঞ্চিত ক'রে শুধু নিজে-নিজে খাওয়ার বিশেষ নিন্দাও র'য়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটা মন্ত্র আলোচনা করা যা'ক—

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য।
নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ম্
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী॥"

(ঋগ্বেদ, ১০৷১১৭৷৬)

অর্থাৎ দানে অনিচ্ছুক যে, সে যে-অন্ন লাভ করে তা' ব্যর্থ। আমি সত্যই ব'লছি, সে অন্নলাভ তা'র পক্ষে বধস্বরূপই। সেই ব্যক্তি আদিত্য প্রভৃতি দেবতা এবং বন্ধু-আত্মীয়-অতিথি প্রভৃতি মনুষ্যকে পোষণ দান করে না। যে কেবল নিজেই ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভক্ষণ করে।—তাহ'লে দেবতা, মনুষ্য

এবং সমগ্র পারিপার্শ্বিককে দেওয়া এবং খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঋগ্‌বেদীয় ঋষির কাছেও কত বড় কর্ত্তব্য হ'য়ে ধরা দিয়েছিল। ঋষি ব'লছেন, সবাইকে বঞ্চিত ক'রে শুধু স্বীয় উদর-পরিপূরণের জন্য ভক্ষণ কেবল পাপভক্ষণ নয়, তা' আত্মহত্যা-সদৃশ। এতে বোঝা যায় যে, প্রাচীন যুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। ইষ্ট, অহং ও পরিবেশ, এই তিনটি নিয়ে মানুষের সামগ্রিক জীবন। তখনকার মানুষগুলি এ-সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তা' এই মন্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। দানযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসায় তৎপর হ'য়ে উঠেছেন বৈদিক ঋষিগণ। বহু জায়গায় আমরা তা'র সমর্থন পাই।

ঐ যজ্ঞের নিত্য-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে আমরা সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ি, আমাদের যশোরাশি বিস্তৃত হয়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই আমার পরিবেশ, প্রত্যেকেই আমার বাঁচার সহায়ক। তাই, সবার জন্যই আমার করণীয় র'য়েছে। এই বিশ্বের মাঝে আরো কোটি-কোটি সত্তার মত আমারও একটি সত্তা আছে, এবং সেই সত্তাটি আর সবার সাথে সম্বন্ধান্বিত। ভাবতেও আনন্দ লাগে। আমি সবারই, সবাই আমার।

আমি সবাতেই, আমাতে সবাই। আর্য্যঋষির চিন্তার কী বিশালতা, কত গভীরতা! এই দুনিয়ায় একক বোধ ক'রে কা'রো দুঃখিত হবার প্রয়োজন নেই। প্রতিপ্রত্যেকের মধ্যেই পারস্পরিকতাবোধ গজিয়ে উঠুক। সবাই উপলব্ধি করুক—তা'রই সব, সবারই সে। তাই, বিষ্ণুপুরাণে ভূতবলি-প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই, সবারই নাম উল্লেখ ক'রে অন্নপ্রদান করা হ'চ্ছে। দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ, তরু, পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ, মাতা-পিতৃহীন, বন্ধুহীন—কা'রো কথাই সেখানে বাদ পড়েনি। আর, এ-দান করা হ'চ্ছে 'ভূতোপকারায়', অর্থাৎ প্রাণীদের উপকারার্থে।

অথর্ববেদের ৯ম কাণ্ডে অতিথি-অভ্যাগতের সেবার কথা বিশেষভাবে বলা আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বলি

গৃহ্যসূত্রগুলিতে সেবা বা দানের মধ্যে যেগুলি প্রশংসনীয়, সেগুলি স্বহস্তে করার বিধান র'য়েছে।

"স্বয়ং ত্বেবাশস্ত্যং বলিং হরেৎ ॥" ২৮ ॥

(গোভিল গৃহ্যসূত্র, ১ম প্রপাঠক, ৪র্থ কণ্ডিকা)

ভাষ্যকার স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন, এই কাজে প্রতিনিধি চ'লবে না। আর, এই 'আশস্ত্য' বলির দ্বারা যজমান দীর্ঘায়ু লাভ করে (গোভিল গৃহ্যসূত্র, ১।৪।২৯)। সূত্রে দু'টি কথা দেখা যাচ্ছে—'আশস্ত্য' এবং 'বলি'। আশস্ত্য-কথাটি আবার বলি-শব্দের বিশেষণ। 'আশস্ত্য' কথার মানে সম্যক্ প্রশংসনীয়, সমীচীনভাবে যা'র কথা বলা যায়, সমীচীনতার মাত্রা অতিক্রম করেনি যা' এমনতর বলি।

'বলি' শব্দের অর্থ প্রামাণ্য অভিধানগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে—কর, উপহার ইত্যাদি। পশুহত্যা নেই। কিন্তু সম্প্রতি 'বলি'-অর্থে পশুহত্যা বোঝাবার একটা চলন এসেছে। দেবতার সম্মুখে পশুবধ করাকে 'বলি' ব'লে থাকেন অনেকে। কিন্তু বলির এ-অর্থ কোনদিন ছিল না। বলি মানে সব সময়েই ছিল, পূজোপহার। যাঁ'কে বিশ্বমাতা ব'লে আরাধনা করি, সবারই যিনি জননী, তাঁ'র সামনে তাঁ'রই সৃষ্ট একটি সন্তানকে (পশু) নিহত ক'রলে কি তিনি খুশী হন—না ব্যথা পান? একটু স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা ক'রে দেখলেই

একথা বোঝা যায়। সন্তানের একটু অসুখ হ'লেই যে-মা অস্থির হ'য়ে পড়েন, তিনি চোখের সম্মুখে তাঁ'র সন্তানহত্যা দেখবেন এবং সেই রক্তে নিজে তৃপ্ত হবেন ? কোন কবির লেখায় প'ড়েছিলাম—

"সমুদ্রেরও তল আছে, পার আছে তা'র,
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার।"

সেই মায়ের সাথে এ কী চালাকি, এ কী ভণ্ডামি যে, ছাগ মহিষ বধ ক'রে তাঁ'র তৃপ্তিসাধন ক'রব ?

উপরিচরবসু রাজা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রছিলেন, তখন ঋষিগণ সেখানে পশুবধ ক'রতে দেননি। তাঁ'রা ব'লেছিলেন—

"বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হত ॥" ৭ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২৩তম অধ্যায়)

অর্থাৎ বীজ দ্বারা যজ্ঞ ক'রতে হবে, এই-ই বৈদিক বিধান। আর, সে-বীজ হ'চ্ছেন অজ, যিনি জন্মরহিত, আদিকারণস্বরূপ, সেই পরব্রহ্ম। যজ্ঞ তাঁ'রই নামে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ছাগহত্যা ক'রতে পার না তুমি। এই দুনিয়ার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে সেই মহাকারণই অবস্থান ক'রছেন। সেই এক শব্দব্রহ্মের অধিষ্ঠান ঋষিরা

সৃষ্টির পরতে-পরতে উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তাঁ'রা দেখেছিলেন, সেই এক কারণই হোতা হ'য়েছেন, হোম-রূপে অবস্থান ক'রছেন। মন্ত্রও তিনি, আহুতিও তাঁ'রই স্বরূপ। পূজা-উপাসনায় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই, 'বীজ'-অর্থে তাঁ'রা সেই পরম কারণকেই বোধ ক'রেছিলেন। আর, সেই বীজের প্রতীকস্বরূপ তাঁ'রা যব, ব্রীহি (এক প্রকার ধান), ইত্যাদি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনের বিধান দিয়েছিলেন। আমাদের এই কথার সমর্থনে উপরি-উক্ত শ্লোকের আবার নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়—

"যবৈর্যজেত ব্রীহিভির্যজেত ইতি শ্রুতেঃ।
বীজার্থে অজশব্দো লাক্ষণিকঃ। মা হিংস্যাৎ
সর্ব্বভূতানি ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতির (বেদের) বিধান হ'ল—যবের দ্বারা যজ্ঞ ক'রবে, ব্রীহির দ্বারা যজ্ঞ ক'রবে। এই শ্লোকে অজ-শব্দের বীজ-অর্থ লক্ষণা দ্বারা সম্পন্ন (ঠিক-ঠিক আভিধানিক অর্থ নয়), অজশব্দের লক্ষণার্থ বীজ। শ্রুতিতেও আছে, কোন প্রাণীকে হিংসা ক'রবে না।

এই যেখানকার বিধান, সেখানে 'বলি' মানে পশু-বধ ক'রে তা'র মাংসভক্ষণ কী ক'রে আসতে পারে,

তা' কল্পনাতীত। সেইজন্য সুরা, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি ঐভাবে আহার করার কথায় মহামতি ভীষ্ম যথার্থই ব'লেছিলেন—

"ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্ত্তিতং হ্যেতন্নৈতদ্বেদেষু কল্পিতম্।
কামান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ লৌল্যমেতৎ প্রকল্পিতম্॥" ১১॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫৯তম অধ্যায়)

—এসব ব্যাপার ধূর্ত্তগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত; বেদে এমনতর কল্পনা নেই। কাম, মোহ এবং লোভবশতঃ এই লোলুপতা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে।

হবিঃ-প্রদানে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে কতকগুলি ওষধির নাম পাওয়া যায়—ব্রীহি, যব, গোধূম, তিল, প্রিয়ঙ্গু, মাষ ইত্যাদি। কর্ম্মপ্রদীপে আছে—

"অভাবে ব্রীহিযবয়োর্দধ্না বা পয়সাঽপি বা।
তদভাবে যবাগ্বা বা জুহুয়াদুদকেন বা॥"
(২৭৩)

—ব্রীহি ও যবের অভাবে দধি ও দুধের দ্বারা অর্ঘ্য দেবে। তা'রও অভাবে যবাগু বা জলের দ্বারা অর্ঘ্য-প্রদান ক'রবে।—গৃহ্যসূত্রেও গোভিল এই মতেরই সমর্থন ক'রেছেন। পশুকামী যে-যজমান, তা'কেও

তিনি পশুবধ ক'রে পশুকামনা ক'রতে বলেননি। তিনি ব'লেছেন—

"পশুকামো বৎসমিথুনয়োঃ পুরীষাহুতিসহস্রং জুহুয়াৎ ॥" ১২ ॥ (৪র্থ প্রপাঠক, ৯ম কণ্ডিকা)

—একটা এঁড়ে বাছুর ও একটা বক্‌না বাছুরের গোময়ের দ্বারা পশুকামী যজমান হাজার বার আহুতি দেবেন।

কী দেখা গেল এতে? জীবহত্যায় যে সাত্বত সম্বর্দ্ধনা আসে, এমনতর কথা কোথাও নেই। একটা প্রাণ যদি দিতে না পারি, তবে একটা প্রাণ নেবার অধিকারও আমার নেই। বরং বলা আছে—"যে কেহ একটি জীবন বাঁচায়, সে যেন সমস্ত মনুষ্যজাতিকে বাঁচাইল"। (কোরান-শরিফ, ৫ : ৩২)। জীব-জগতের বাঁচাবাড়াই একমাত্র কল্যাণের পথ। আমাদের সমস্ত শেখা, চলা, বলা, ভাবার মধ্যে যদি একটা দাঁড়া না থাকে, তবে আমাদের চিন্তাচলন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে। এটাও ভাল লাগে, ওটাও ভালবাসি—এই ক'রে কোনটাতেই লেগে থাকতে পারব না। নিষ্ঠা ব'লে কিছু থাকবে না। আর, নিষ্ঠাহারা জীবনের দুর্গতি অশেষ। তা'রা চঞ্চল, অস্থিরমনা, সব সময়েই অতৃপ্ত। কিন্তু যা'র মন একটা বিষয় বা ব্যক্তিকে নিয়ে ভরপুর

হ'য়ে আছে, সে নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ। তা'র প্রতিটি কাজকর্ম্মের, চালচলনের সে একটা অর্থ খুঁজে পায়। আমাদের জীবনেরও এমনতরই একটা দাঁড়া থাকা দরকার। সে-দাঁড়া হ'ল—জীবনমঞ্চ। জীবন তো সবাই চায়। তাই, কিছু বুঝতে হ'লেও ঐ জীবন-দাঁড়াতেই তা'র বিচার করা ভাল। তখন সব-কিছুরই প্রকৃত সঙ্গত অর্থবোধ সম্ভব হ'য়ে উঠবে। এইদিকে দৃষ্টি রেখে চ'ললেই 'বলি'-শব্দের অর্থ বুঝতে আমাদের আর কষ্ট হবে না।

'বলি'-শব্দের উৎপত্তি বল্-ধাতু থেকে, অর্থ— জীবন, বেষ্টন, সমৃদ্ধি, দান। এ ছাড়া, বল্-ধাতুর যে হিংসা ও বধ অর্থ আছে, তা'র মানে, জীবন-সমৃদ্ধির হানিকর যা', তা'র প্রতি হিংসা, তা'কে বধ। আর, এই হিংসা ও বধ অর্থ পরবর্ত্তীকালের আগম ব'লে মনে হয়। কখনও হয়তো ভাষায় কোন বিশেষ অর্থে একটা শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। পরে তা'র ধাত্বর্থে ঐ লোকব্যবহারে প্রযুক্ত অর্থটিও ঢুকে গেছে। পরবর্ত্তী-কালে এভাবে অনেক ধাতুর অনেক অর্থ বেড়ে গেছে। কিন্তু সেগুলি কালজয়ী আসন লাভ ক'রতে পারেনি। যে-অর্থগুলি জীবনীয়, জীবনপ্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হ'য়েছে,

সেইগুলিই শাশ্বত কালজয়ী হ'য়ে স্বমহিমা ঘোষণা ক'রে চ'লেছে। প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার জন্য আমাদেরও দৃষ্টি দিতে হবে ঐ জীবনবর্দ্ধনী অর্থগুলির দিকে। শব্দের মূল দ্যোতনা ঐগুলির মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।..........শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রেও ব্রীহি, যব, তিল, সর্ষপ, অপামার্গ (আপাং) ইত্যাদি দ্বারা আহুতি প্রদানের কথা আছে।

আর একটা বলির কথা আমরা পাই, সেটা হ'ল বৈশ্বদেব বলি। বৈশ্বদেব—বিশ্বদেব-সম্বন্ধীয়। বৈশ্বদেবকর্ম্মও পঞ্চমহাযজ্ঞেরই আর-এক নাম। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (২।৯।৩—৮) আমরা এই বৈশ্বদেবকর্ম্ম বা বিশ্বভূতবলির কথা পাই, পঞ্চমহাযজ্ঞ যা'র নামান্তর। শতপথব্রাহ্মণের ১১শ কাণ্ডে আমরা এর প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে আছে—

"পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি॥" ১॥

(৫ম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ পাঁচটি মহাযজ্ঞ। এগুলি মহাসত্র (সত্র=এক প্রকার যাগ)—ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। এর পরের মন্ত্রেই আবার বলা

আছে— এই যজ্ঞগুলি নিত্য যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান ক'রতে হবে প্রতিটি গৃহস্থেরই।

"অহরহর্ভূতেভ্যো বলিং হরেৎ।"

—অহরহই ভূতগণকে বলি প্রদান করবে। এই ক্রমে অহরহ অর্থাৎ প্রতিদিনই এই যজ্ঞ সম্পাদন করার কথা র'য়েছে। এই বৈশ্বদেবকর্ম্মে ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থ নিজেই এর অনুষ্ঠান ক'রবেন প্রত্যহ। এই হ'ল বিধান। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, এই বলিহরণ অর্থাৎ সবার তৃপ্ত্যর্থে নিত্য অর্ঘ্যদানের ব্যবস্থা আজ কিছু নতুন নয়। সেই সুদূর বেদ-ব্রাহ্মণের যুগেও ঋষিগণ বোধ করেছিলেন এর অপরিহার্য্যতা।

বিশ্বদেব-শব্দের অর্থ 'বিশ্বে দেবাঃ', অর্থাৎ সমস্ত দেবগণ। তাই, গরুড়পুরাণে বৈশ্বদেব-বলি-প্রসঙ্গে পুষ্টিকামী যজমানের ইন্দ্র, অগ্নি, দ্যাবাপৃথিবী, ধন্বন্তরি, জল, ওষধি, বনস্পতি, গ্রহ, যমপুরুষ, এক-কথায় সর্ব্বভূতকে অর্ঘ্যনিবেদনের কথা আছে। এই বৈশ্বদেব-বলিও নিত্য অনুষ্ঠেয়, আমরা তা' দেখলাম। শাস্ত্র ব'লছেন—এর দ্বারা মানুষের অর্থ, আয়ু, কীর্ত্তি ও সন্তান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বদেবের মধ্যে বোধহয়

সমস্ত দেবতাকেই একত্রে আহ্বান জানাতে হ'ত; অন্ততঃ বিশ্বদেব-শব্দের অর্থ তা'ই-ই সূচিত করে। কী যে হ'ত সে-সময়ে, তা' আজ আর স্পষ্টভাবে জানার কোন উপায় নেই। টীকাকারদের উপর অনেকখানি নির্ভর করা লাগে। তাঁ'রা যে-পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, আমাদের বুঝতে হ'লে তা'রই উপর দাঁড়িয়ে এগোতে হবে—নিজেদের দাঁড়া অটুট রেখে। 'বিশ্বদেব' মানে যদি সমস্ত দেবতা হয়, তবে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত দেবতার একটি সম্মিলিত অধিষ্ঠান কল্পনা ক'রে নেওয়া হ'চ্ছে। পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান বাদেও এমন কোন একটি সাধারণ বেদীতে বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে পূজার বিধান থাকা সম্ভব, যেখানে সকলেই অধিষ্ঠিতি লাভ ক'রেছেন বা ক'রতে পারেন। সেই সাধারণ বেদীর ইঙ্গিত আমরা মূর্ত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীর মধ্যেই পাই শ্রীমদ্ভাগবতে। সেখানে ১৭শ অধ্যায়ের ১১শ স্কন্ধের ২৭শ শ্লোকে তিনি ব'লছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে—

"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

—সমস্ত দেবতারই সাকার মূর্ত্তি হ'চ্ছেন গুরু বা ইষ্টদেব। তিনিই অগ্নিমুখ, সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম।

তিনিই ধ্যেয়, তিনিই যাজ্য, তিনিই উপাস্য! ভর্ত্তব্য তিনিই, সেব্য তিনিই। তাঁ'র সেবাতেই পঞ্চমহাযজ্ঞ সার্থক হ'য়ে ওঠে। পঞ্চমহাযজ্ঞের প্রথমটিই হ'ল— ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ। আর, গুরুই সেই সাকার ব্রহ্ম। "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম"। তিনিই ঋষি, সত্যদ্রষ্টা।

এই গুরুকরণ ও গুরুসেবা বর্ত্তমানের চল্‌তি রকমের গুরুসেবা নয়। সারাজীবন নানারকম অকার্য্য-দুষ্কার্য্য ক'রে, মস্তিষ্কে তা'র ছাপ ভালমত নিয়ে তা'র-পর বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন হ'য়ে ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মন দেবার চেষ্টা ক'রলে কিছুই হয় না। সারাজীবন ধ'রে যা' ক'রেছি, মস্তিষ্কে তা'রই ছাপ প্রবল হ'য়ে থাকে। শেষকালে হাজার হরিনামেও কোন ফল হয় না। জীবনভোর যে-জিনিষটার 'পরে আমি বেশী আসক্ত ছিলাম, পৃথিবী ছেড়ে যাবার বেলাতে তা'রই চিন্তা আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে। আর, এ-জীবনের যেখানে শেষ, পরজীবন আবার ঠিক সেখান থেকেই আরম্ভ। যদি কোন অসৎ বা দুষ্ট চিন্তায় আমি অভিভূত থাকি, আমার পরবর্ত্তী জন্মও ঘটবে ঠিক সেখানে, যেখানে ঐ অসৎকর্ম্ম ও দুষ্ট প্রবৃত্তি বেশ সাবলীল গতিতে চ'লেছে। আর, যদি কোন সৎজীবনের

চিন্তায় মনটা ভরপুর হ'য়ে থাকে, তবে জন্মও হয় তেমনতর শুভসুন্দর পরিবেশে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রেয়কর্ম্ম

আমরা গোড়ার দিকে দেখেছি, জীবনের সবরকম স্মৃতি ও চিন্তা কিভাবে মস্তিষ্কের কোষে-কোষে সঞ্চিত থাকে। আর, যে-চিন্তাশক্তির দ্বারা মস্তিষ্ককোষকে আমরা যেভাবে উত্তেজিত ও সংগর্ভিত ক'রে থাকি, আমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত হয়। শুধু ভাবা কোন বিষয়কে আমাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল ক'রে ধ'রে রাখতে পারে না। ভাবার সাথে করা চাই। চিন্তাশক্তির সাথে কর্ম্মশক্তির যোগ হ'লে তখনই সেটা স্থায়িভাবে মস্তিষ্কে বাসা বাঁধতে পারে। সেইজন্য, মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে কর্ম্ম-সমন্বিত চিন্তার উপর বেশী জোর দেওয়া হ'য়েছে। কুচিন্তাটাকে তত অপরাধ ব'লে গণ্য করা হয় না। কিন্তু ঐ কুচিন্তা যখনই কর্ম্মে রূপ নিল, তখনই সেটা

অপরাধ ব'লে পরিগণিত হ'ল। বিপরীতক্রমে, সুচিন্তাও প্রশংসনীয় হ'য়ে ওঠে না ততক্ষণ, যতক্ষণ তা' বাস্তব কর্ম্মে রূপ পরিগ্রহ না করে। কর্ম্মই ভাবাকে বাড়িয়ে দেয়। বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি, যাঁরা অনেক ভাল কথা বলেন, কিন্তু কাজে তা' করেন না, তাঁ'দের কথার উপরে মানুষ বেশী মূল্য দেয় না। কিন্তু যাঁ'রা কথা হয়তো কম বলেন, কিন্তু সৎকর্ম্মে তৎপর, তাঁ'দের মানুষ শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে।

চিন্তাটা চাই। চিন্তাকে বাদ দিলে কর্ম্মের পরিকল্পনা ও কৌশল পাব না। কিন্তু চিন্তার সাথে করা এবং করার সাথে চিন্তা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকা চাই যে, একটাকে বাদ দিয়ে আর-একটা চলেই না। করার সাথে-সাথেই সেটাকে আরো সুষ্ঠু সুন্দর পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার চিন্তা ক'রতেই হয়। তাই, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের উপরে বেশী জোর দিয়েছেন। চিন্তাফলের কথা কিন্তু তাঁ'রা এমনভাবে বলেননি। অনুষ্ঠানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কর্ম্মহীন শুধু চিন্তা আমাদের লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারে না। লক্ষ্যে অচ্যুত থাকতে হ'লে কর্ম্ম বা কৃতি অপরিহার্য্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই—

"যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি। নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি। কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি। কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।" ১।

(৭ম অধ্যায়, ২১শ খণ্ড)

অর্থাৎ ক'রলেই নিবিষ্ট হ'য়ে থাকা যায়, অর্থাৎ নিষ্ঠা আসে। না ক'রলে নিবিষ্টভাবে থাকা যায় না। ক'রেই নিবিষ্ট থাকতে হয়। অতএব, কৃতিকেই জানতে হবে।—এই নিবেশসহকারে থাকাই হ'ল নিষ্ঠা। আর, এমন কৃতি বা কর্ম্ম জেনে তা'র অনুষ্ঠান ক'রতে হবে, যা'তে ঐ নিষ্ঠা অব্যাহত, অস্খলিত হ'য়ে থাকে।

কর্ম্মে বন্ধন আসে, তা' মুক্তির বাধাস্বরূপ—এমন একটা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি ক'রে কেউ-কেউ কর্ম্মানুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার কথা ব'লেছেন। তাঁ'রা ব'লে থাকেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির কথা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমরা শুনতে পাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।" ৪।

(গীতা, ৩য় অধ্যায়)

—কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আগে কর্ম্ম কর, তা'রপর সিদ্ধি। তিনি আরো ব'লেছেন, সতে ন্যস্ত কর্ম্ম ছাড়া সিদ্ধি আসে

না। নিয়ত কর্ম্ম কর। কারণ, কর্ম্ম বিনা তোমার শরীর ধারণ করাও সম্ভব নয়। সেখানে আর নৈষ্কর্ম্ম্যের ঐ অলস দার্শনিক মতবাদ টিঁকবে না।

গীতার ঐ কর্ম্মযোগ-অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন, এমন কর্ম্মও আছে যা' বন্ধন আনে না, যা' লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। তা' হ'ল যজ্ঞার্থে কর্ম্ম। ফলপ্রত্যাশাবিহীন হ'য়ে যজ্ঞার্থে অর্থাৎ ইষ্টপ্রীতি-কেন্দ্রিক লোকচর্য্যার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ক'রতে পারলে মানুষ প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করে। আর, সর্ব্বযজ্ঞের মূর্ত্তিমান্ অধীশ্বর তিনিই—ঐ জীয়ন্ত নরবিগ্রহ শ্রীপুরু-ষোত্তম। তাই, তাঁ'তেই সর্ব্বকর্ম্ম ন্যস্ত ক'রে অর্থাৎ তঁৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম ক'রে চলার কথাই ব'লেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সারাদিনে, সমস্ত জীবনে যত কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমরা করি, তা' তাঁকেই প্রতিষ্ঠা করুক, তাঁ'রই বন্দনা করুক। ফলের জন্য ভাবতে হবে না। সিদ্ধি আপনিই এসে দোরগোড়ায় হাজির হবে। মুক্তি তো অনেক কাছের কথা, অচ্যুত ঈশ্বরভক্তিতে তখন মানুষের হৃদয় ভরপুর হ'য়ে থাকে। মুক্তির থেকেও ভক্তি দুর্লভ্য। ভক্তি হ'লেই মুক্তি স্বতঃই এসে উপস্থিত হয়। তাই, আবার আমরা শুনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" ২৭ ॥
(গীতা, ৯ম অধ্যায়)

—হে কৌন্তেয়! তুমি যা' কর, যা' খাও, যা' আহুতি দাও, যা' দান কর, যা' তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্পণ কর। আর, ইষ্টে সর্ব্বকর্ম্মফল-অর্পণই ভক্তির আগমরহস্য। আবার, যে-ফল ইষ্টকে অর্পণ ক'রতে হবে, সেটি হওয়া চাই উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। নিকৃষ্ট দ্রব্য কখনও প্রিয়জনকে দেওয়া হয় না, গুরুকে তো নয়ই। সেজন্য কর্ম্মও সব সময় উৎকৃষ্ট হওয়া দরকার, যা'তে ফলটিও উৎকৃষ্ট হয়। তাই, কর্ম্মফলত্যাগ মানে কর্ম্মত্যাগ নয়, বরং কর্ম্মটিকে আরো সুন্দর ও সুচারুভাবে করা, যা'তে তা'র বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বার্থ-সার্থক ফলটি ইষ্টচরণে নিবেদিত হ'তে পারে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দানযজ্ঞ

নিত্য দানযজ্ঞ কর্ম্মযজ্ঞেরই একটা অঙ্গ। সৎকে, শ্রেষ্ঠকে নিত্য দান, তাঁ'র নিত্য সেবাবিধানের ভিতর-দিয়ে আমাদের সমস্ত চিন্তাচলন শ্রেয়-অভিমুখী হ'য়ে

চ'লতে থাকে। কারণ, তখন সৎচিন্তাই আমাদের মনকে অভিভূত ক'রে রাখে। আমরা সেই কথাই ভাবি, তদনুযায়ী কাজ করি। আর, ঐ অনুচলনের ফলে জীবনটাও আমাদের সৎ, শুভদ, নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে ওঠে। আমরা তখনই প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ করি।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদও আমরা বোধ ক'রতে পারি এই অনুচলনের ফলে। আশীর্ব্বাদ মানেই কিন্তু অনুশাসনবাদ। যে সৎ-অনুশাসন-অনুযায়ী চলার ফলে আমরা শুভ ফল লাভ করি, সেই অনুশাসনই আশীষ (আশীর্ব্বাদ)। নিরুক্তকার যাস্ক 'আশীঃ'-শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ক'রতে গিয়ে একস্থানে ব'লেছেন—

"আশীরাশাস্তেঃ।"

(নৈগমকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পাদ)

—আ-শাস্ ধাতু থেকে আশীঃ-শব্দের উৎপত্তি, অর্থ—সম্যক্ বা সর্ব্বতোভাবে শাসন বা উপদেশ দান। এর থেকেই 'আশীঃ' মানে অনুশাসন। আশীর্ব্বাদ তখনই আমাদের মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, যখন আমরা ঐ শ্রেয়-অনুশাসন মত চলি। দেবতা বা ঈশ্বরের যে আশীর্ব্বাদ আমরা পাই ব'লে বলি, তা'রও তুক কিন্তু ঐই। কোন জীবন যখন অপর কোন মহা-

জীবনের গুণাবলীর বিহিত অনুসরণ ক'রে, যে-যে অনুশাসন অনুসরণ ক'রে তিনি বড় হ'য়ে উঠেছেন তা'র অনুশীলন করে, এবং ফলস্বরূপ তাঁরই দীপ্তিমান্ চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে নিজের গুণসমন্বিত সৎ-চরিত্রচ্ছটায় মানুষের মন আলোকিত ক'রে তোলে, তা'কেই আমরা ব'লতে পারি—আশীর্ব্বাদলব্ধ জীবন।

তাহ'লে এখানে একটা ব্যাপার খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পেতে হ'লে দিতে হবে, ক'রতে হবে আগে। আগে ত্যাগ, তা'রপরে ভোগ। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" (ঈশোপনিষদ)। আগে প্রত্যাশা-রহিত হ'য়ে দাও, তৃপ্তিদান কর; ফলস্বরূপ, তুমিও পাবে। কিন্তু পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে দিলে কিছু হবে না। নিঃস্বার্থ দান হওয়া চাই। এই অবস্থাটাই গীতায় শ্রীভগবান্ কর্ম্মযোগ-অধ্যায়ে ব'লেছেন—

"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥" ১২॥
(৩য় অধ্যায়)

—তোমাদের যজ্ঞদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগসমূহ প্রদান ক'রবেন। তাঁ'দের প্রদত্ত বস্তুসমূহ তাঁ'দিগকে প্রদান না ক'রে যে খায়, সে চোর।

দেবতা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ চরিত্রের যেসব সদ্‌গুণ, সেগুলিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, সংসার-সমাজকে সেগুলিই মধুক্ষরা ক'রে তোলে, বাঁচার উপযোগী ক'রে তোলে। শুধু হিংসা-দ্বেষ-অহঙ্কার নিয়ে কখনও মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বাঁচতে হ'লেই তা'কে প্রীতি-স্নেহ-ভক্তি, সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায় ইত্যাদি কল্যাণময় গুণের দ্বারা বাঁচতে হয়। আর, এইসব গুণের অনুশীলনেই আসে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন, পারস্পরিক সংহতি। মানুষ স্বস্তি বোধ করে, বাঁচার স্বাদ পায়। দেবগণের কাছ থেকে আমরা অহরহই এই অমৃত-আস্বাদন পেয়ে থাকি। তা' ভালভাবে বোধ ক'রতে গেলে প্রথমে চাই তাঁদের দেওয়া, তাঁ'দের সেবা করা। তখন দেবগণ কর্ত্তৃক যে-সম্বর্দ্ধনা তা'ও আমরা বোধ ক'রতে পারব। শ্রমের ভিতর-দিয়ে যা'-কিছু আমরা অর্জ্জন বা আয়ত্ত করি, তা'র প্রতি আমাদের দরদও থাকে এবং সে-সম্বন্ধে আমাদের একটা বোধও থাকে পরিষ্কার। এই আদান-প্রদানকে আবার অন্যরকম ক'রে দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতে—

"ইতো দত্তেন জীবন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা।
তে প্রীতাঃ প্রীণয়ন্ত্যেনমায়ুষা যশসা ধনৈঃ॥" ৫৮॥
(অনুশাসনপর্ব্ব, ৮৫তম অধ্যায়)

—এখান থেকে যা' দেওয়া হয়, দেবতা ও পিতৃগণ তা'র দ্বারা জীবনধারণ করেন। বিনিময়ে তাঁ'রা প্রীত হ'য়ে মানুষকে আয়ু, যশ ও ধন দ্বারা নন্দিত করেন।

ইসলামেও এই দানের কথা পুনঃ-পুনঃ বলা হ'য়েছে। জাকাত-প্রদান প্রতিটি মুসলিমেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-শরিফ বারংবার ব'লেছেন—"তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর।" (২ঃ৪৩) এই জাকাতও ধর্ম্মার্থে, জনকল্যাণার্থে দান ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই যে বাস্তব বিপুল ধর্ম্মজীবন, এর অনুষ্ঠান সুরু হ'ত আমাদের শৈশব থেকেই—বৃদ্ধকালে নয়। ঋষি-গণ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব বিষয়ের গুণাগুণ বিচার ক'রে যে কল্যাণকর বিধান প্রণয়ন ক'রে গেছেন, সেগুলিই আমাদের শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রীয় বিধানই হ'ল—জীবনের প্রারম্ভে পিতামাতার সেবার সাথেই গুরুসেবা। কারণ—

"গুরুশুশ্রূষয়া জ্ঞানম্।" ৫২।
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৬শ অধ্যায়)

—জ্ঞানলাভের মূলই হ'ল গুরুশুশ্রূষা; গুরুর চরণে প্রণিপাত, তাঁ'র কাছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে থাকা, এবং তাঁ'র সেবা করা—এই তিনটি প্রক্রিয়াকে জানার উপায় ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে গীতায়। আর, ব্রহ্মদাতা গুরু যিনি তিনি সবারই গুরু—পিতারও গুরু, পুত্রেরও গুরু, স্বামীরও গুরু, স্ত্রীরও গুরু। কারণ, সর্ব্ববিদ্যার সার যে-ব্রহ্মবিদ্যা, তা' তাঁ'র কাছেই পাওয়া যায়। তাই, আচার্য্যকরণ, আচার্য্যকে নিত্য অর্ঘ্য-অবদান এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধান সবার জন্যেই র'য়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিত্যদান

ইষ্টরূপী আচার্য্যের সেবা, তাঁ'কে নিত্য অর্ঘ্য-অবদানের ভিতর-দিয়ে মানুষ ক্রমবিস্তারের পথে এগিয়ে চলে। আবার, ইষ্ট যিনি তিনি সবারই ইষ্ট। প্রাণ সকলেই চায়। ম'রতে কেউই চায় না। আর, ইষ্ট হ'চ্ছেন সেই জীবনযজ্ঞের পুরোহিত, প্রাণের ঋত্বিক্। তাই, তাঁ'কে দান, তাঁ'কে ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে শিষ্যের উপর। কারণ, আমরা বেঁচে থাকি, সুস্থ থাকি যাঁ'র দয়ায়,

আগে তাঁ'কেই বাঁচাতে হয়, সুস্থ রাখতে হয়। তা' যদি না রাখি, অর্থাৎ আমার বাঁচার উৎসই যদি শুকিয়ে যায়, শীর্ণ হ'য়ে যায়, তবে আমার বাঁচাটাও থেমে যাবে। সেজন্য, গুরুর সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হ'য়ে উঠছে।

পিতামাতা শিশুর নিকটতম পরিবেশ। তাঁ'দের কাছে এ-শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। তাঁ'দের প্রতি নিত্য দান ও সেবার অভ্যাস যখন চরিত্রগত হ'য়ে ওঠে, তখন গুরুর উপরেও তা' সহজভাবে ফুটে ওঠে।

"গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ।" ১৮।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১০৫তম অধ্যায়)

—পিতামাতার থেকেও গুরু গরীয়ান্, ভীষ্মদেবের উক্তি। তিনি আবার ব'লেছেন—

"যদগ্নিহোত্রে সুহুতে সায়ং প্রাতর্ভবেৎ ফলম্।
বিদ্যাবেদব্রতবতি তদ্দানফলমুচ্যতে॥" ১০॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৯শ অধ্যায়)

অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রযজ্ঞে সুষ্ঠু আহুতি-দানে যে-ফল হয়, বিদ্যাবান্ ও বেদব্রতধারীকে দান ক'রলে সেই ফল হয়।

বিষ্ণুসংহিতার ৩১শ অধ্যায়ে আমরা পাই,

পুরুষের অতিগুরু তিনজন—মাতা, পিতা এবং আচার্য্য। নিত্যই তাঁ'দের শুশ্রূষা ক'রবে। তাঁ'রা যা' বলেন, তা' ক'রবে। তাঁ'দের প্রিয় ও হিতকর যা', তেমনতর আচরণ ক'রবে। তাঁ'দের অননুমোদিত কিছুই ক'রবে না। এই তিনজন যা'র কাছে আদৃত, ধর্ম্মও তা'র কাছে আদৃত। আর, এই তিনজনকে যে অবহেলা করে, তা'র সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হ'য়ে যায়। আবার, ব্রহ্মোক্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় র'য়েছে, গুরুর কাছ থেকে আমরা সেই পরাবিদ্যা লাভ ক'রে থাকি। যে অমৃতত্ব লাভের জন্য মুনিঋষিরা বৎসরের পর বৎসর সাধনা ক'রেছেন, তা'র সন্ধান পাওয়া যায় ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কাছেই। তাই, তাঁ'কে পিতৃবৎ পরি-পালন ক'রতে হবে (৮ম অধ্যায়)। সংহিতাকার বশিষ্ঠও ব'লেছেন, নিত্য গুরুর সেবা ক'রবে। নিজেই আহরণ ক'রে তাঁ'কে খাওয়াবে। তা'রপর

"আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাত ভুঞ্জীত নিয়মো ব্রতী।" ৭৬॥

(৩য় অধ্যায়)

—আচার্য্যের দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে নিয়মশীল ব্রতধারী শিষ্য নিজের আহার সম্পন্ন ক'রবেন। আর, সেই ভোজনই হ'ল—যজ্ঞাবশিষ্টভোজন।

ষোড়শ অধ্যায়

আচার্য্যভরণ

পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের কথাগুলি ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে আমাদের একবার একটু পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি-পাত ক'রতে হবে—সেই আর্য্যভারতের দিব্যভূমিতে।

দ্বিজাচারী বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যসন্তান যথাকালে গুরুগৃহে যেয়ে গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন। গুরুগৃহে থেকেই এগিয়ে চ'লেছে তাঁদের তপস্যা ও বিদ্যার্জ্জন। অতি প্রত্যূষে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও উপা-সনাদি সেরে ব্রহ্মচারিগণ গুরুকে প্রদক্ষিণ ক'রে বেরিয়ে প'ড়তেন লোকালয়ে। গ্রামে অন্যান্য মানুষের সাথে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপিত হ'ত। প্রতিপ্রত্যেকের অভাব-অসুবিধার সাথে তাঁরা সম্পৃক্ত হ'তেন এবং সেগুলি নিরাকরণের জন্য সচেষ্ট হ'তেন। গুরুর শিষ্ট অমোঘ সমাধানবাণী ছিল তাঁদের পথপ্রদর্শক। পরিবেশ এইভাবে তাঁদের কাছ থেকে উপকৃত হ'য়ে, তাঁদের দরদভরা সেবায় মুগ্ধ হ'য়ে, যে-উপচার তাঁদের সেবার জন্য দিত, তা'ই ছিল তাঁদের ভিক্ষা। শুধু হাত পেতে কখনও তাঁ'রা ভিক্ষা ক'রতেন না। সে-ভিক্ষাকে আদর্শ ভিক্ষার সম্মান দেওয়া হ'ত না।

ঋগ্বেদের সময় থেকেই ঐ জাতীয় ভিক্ষা নিন্দনীয় ছিল। ঋষি গৃৎসমদ ঐ ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকে ঘৃণা ক'রে ব'লে গেছেন—

"মাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্।"

(ঋগ্বেদ, ২।২৮।৯)

—হে রাজন্! আমাদের অন্যের পরিশ্রমলব্ধ অন্ন যেন ভোজন ক'রতে না হয়। ও জিনিষ কেউই চাননি আমাদের দেশে। তাঁ'রা যে-ভিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, সে-ভিক্ষায় ছিল ভজন। আর, ভিক্ষা-শব্দের উৎপত্তিও ভজ্-ধাতু থেকে (দ্রঃ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান, মনিয়র্ উইলিয়মস্), অর্থ—সেবা, অনুরাগ, অনুশীলন, প্রাপ্তি, বিভাগ, দান। এই অর্থগুলি যেখানে সক্রিয় সার্থক হ'য়ে ওঠে, মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, সেখানেই ভিক্ষার সার্থকতা। আর, আমাদের ঋষির আশ্রমের ব্রহ্মচারিবৃন্দ সেই ভিক্ষাই ক'রতেন।

ভিক্ষা ক'রে যা' পেতেন, সবই নিয়ে এসে সমর্পণ ক'রতেন তাঁ'দের গুরু—আচার্য্যকে। আচার্য্য-প্রদত্ত বিধানের অনুগমন ও অনুশীলনই ছিল তাঁ'দের তপস্যা। তাঁ'কে সুস্থ রাখা, তাঁ'র স্বার্থ-পরিপূরণই ছিল সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য। তাই, আচার্য্যের আহার-

গ্রহণানন্তর তাঁ'রই দ্বারা অনুজ্ঞাত হ'য়ে ব্রহ্মচারীরা আহার গ্রহণ ক'রতেন। সেইরকম আহারের জন্য তাঁ'দের বলা হ'ত—"বিঘসাশী"। সেই অশন অর্থাৎ ভোজন ছিল পাপমোচক, অমৃতসদৃশ।

এই আহরণক্রিয়া এবং আচার্য্যকে নিবেদন-প্রক্রিয়ার কথা আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে এইভাবে আছে—

"তৎ সমাহৃত্যোপনিধায়াচার্য্যায় প্রব্রূয়াৎ। ৩১।
তেন প্রদিষ্টং ভুঞ্জীত॥" ৩২॥

(১ম প্রশ্ন, ৩য় কণ্ডিকা)

—ভিক্ষা আহরণ ক'রে আচার্য্যকে সমস্ত নিবেদন ক'রে জানাবে। তা'রপর, তাঁ'র দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে আহার ক'রবে। আবার, নিজেই যে-দান ক'রবে আচার্য্যকে, তা' অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য যেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা না করা হয়। নিষেধ করা আছে—

"দত্ত্বা নানুকথয়েৎ॥" ২২॥

(আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২য় প্রশ্ন, ৭ম কণ্ডিকা)

দিয়ে কখনও তা' ব'লবে না। আসল কথা, কোন ব্যাপারেই যেন অহং জেগে না ওঠে। গুরুর কাছে নিরভিমান হ'য়ে থাকা চাই। স্বার্থপ্রত্যাশা কিছু থাকবে না। একমাত্র প্রত্যাশা—আচার্য্যের

স্বস্তিবিধান ও তাঁ'র স্বার্থরক্ষা। আবার, গৃহ্যসূত্রকার শাঙ্খায়ন ঋষিও ব'লেছেন, ব্রহ্মচারী গ্রামে ভিক্ষা ক'রতে যাবেন। ভিক্ষা নিয়ে এসে—

"আচার্য্যায় ভৈক্ষ্যং নিবেদয়িত্বাঽনুজ্ঞাতো
গুরুণা ভূঞ্জীত ॥"

(২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

—ভিক্ষাসমূহ আচার্য্যকে নিবেদন ক'রে তাঁ'র অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়ে তা'রপর ভোজন ক'রবে।

আমাদের শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এই আচার্য্যভরণ বা ইষ্টভরণের কথা। নিত্য দৈনিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এই ইষ্টভরণ অর্থাৎ ইষ্টকে ভরণ, পোষণ ও পূরণ করা (ভৃ-ধাতুর অর্থ) অনিষ্টের ক্রূর-কুটিল হাতছানিকে ব্যর্থ ক'রতে সক্ষম হয়।

গুরুগৃহ হ'তে সমাবর্ত্তন নিয়ে ব্রহ্মচারী যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ ক'রতেন, তখনও তাঁ'র ঐ নিত্য-কর্ম্ম চ'লতে থাকত। পিতামাতার সেবা ও পঞ্চ-মহাযজ্ঞের আকারে তখন এগুলি আমরা চল্‌তি দেখতে পাই। এই ব্রতে যাঁ'রা চির-অস্খলিত, তাঁ'রা জনগণের কাছে আদরণীয় ও নমস্য হ'য়ে থাকতেন। তাঁ'দের ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান বহু লোককে প্রেরণা দান ক'রত,

জীবনচলনার পাথেয় জোগাত! ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ পর্য্যন্ত এই ব্রতশীলদের শ্রদ্ধা ক'রতেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে একদিন তিনি ব'লছিলেন—

"যে ভৃত্যভরণে শক্তাঃ সততং চাতিথিব্রতাঃ।
ভুঞ্জতে দেবশেষাণি তান্ নমস্যামি যাদব ॥" ১২ ॥
(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৩০শ অধ্যায়)

—হে যদুনন্দন! যাঁ'রা ভৃত্যদের ভরণে সক্ষম, নিয়ত অতিথিসেবাপরায়ণ, এবং দেবতাকে ভোজ্য-প্রদানানন্তর যাঁ'রা অবশিষ্টাংশ ভোজন করে, আমি তাঁ'দের নমস্কার করি।

নিত্য এমনি সৎ ও সেবাপরায়ণ সক্রিয় মনোভাব নিয়ে চলার ফলে মানুষের চিন্তারাজ্যের এমনই একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়, যা'র খোঁজ আমরা অনেকেই রাখি না। নিরন্তর অবিমিশ্র নিষ্ঠানন্দিত সৎ-চলনের ভিতর-দিয়েই সেখানে পৌঁছানো যায়। অপরের ভাল করার চেষ্টা ও সবার যা'তে ভাল হয় তা'ই ভাবা আমাদের সাড়াগ্রাহী স্নায়ু (sensory nerve) এবং সাড়াসঞ্চারী স্নায়ু (motor nerve)—উভয়ের উপরেই ক্রিয়া করে। আর, সাড়াসঞ্চারী স্নায়ুতে

যখন ঐ ভাল, ঐ কল্যাণটাই স্পন্দিত হ'তে থাকে, তখন আমাদের চলাবলাও তেমনিভাবেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। এই বাস্তব করাটা প্রতিনিয়ত অভ্যাসের ফলে মানুষের চরিত্রে যে-রূপান্তর ঘটায়, তা'তে সে মহনীয় হ'য়ে ওঠে। তা'র প্রতিটি চলায়, প্রতিটি চাউনিতে ফুটে উঠতে থাকে সৎ ও সত্যের ঝলক। সেজন্য, ঐ অভ্যাসের অত দাম। আর, একটা সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত দীপ্ত ব্যক্তিত্ব দেশকে তথা মনুষ্যজাতিকেই সৎপথে যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অন্য কোন কিছুই ততটা পারে না। এই সত্য উপলব্ধি ক'রেছেন এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট্ আইন্স্টাইন্। তিনি ব'লেছেন—

"I am absolutely convinced that no wealth in the world can help humanity forward. The example of great and pure individuals is the only thing that can lead to noble thoughts and deeds."

(From Ideas & Opinions)

—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, পৃথিবীর কোন সম্পদ্ই মানুষকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে দিতে পারে না।

মহান্ এবং পবিত্র জীবনের উদাহরণই একমাত্র বস্তু যা' মহৎ চিন্তা ও কর্ম্মের দিকে চালিত ক'রতে পারে।

যুগে-যুগে আমরা এমনতর মানুষেরই খোঁজ করি, যাঁ'র সুনিয়ন্ত্রিত জীবনবিভা অনিয়ন্ত্রিত জীবনগুলিতে আনতে পারে ধৃতির স্রোত, কল্যাণের মুক্ত স্বাদ, স্বস্তির সলীল প্রবাহ। এমন মানুষকেই আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা ক'রে থাকি, নেতার আসনে বসিয়ে থাকি, পথপ্রদর্শক ব'লে তাঁ'রই শরণাপন্ন হই। তিনি সৎ অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধিদ আচরণে সিদ্ধকাম ব'লে আমরা তাঁ'কে ব'লে থাকি আচার্য্য। তাঁ'র সার্থক সমাধানী পরম পবিত্র অমিয় নিদেশের সক্রিয় অনুসরণে বহু অশান্ত প্রাণ শান্ত হয়, শোকার্ত্ত সান্ত্বনা পায়, জ্ঞানী তাঁ'র বাঞ্ছিত ধনের সন্ধান পান, ছন্নছাড়া সুস্থ জীবন-যাপনে প্রবৃত্ত হয়। এই মহিমময় অনুসরণের ফলেই অতি সাধারণ লোক হ'য়েও আজ সেণ্ট্ পল, সেণ্ট্ পিটার জগতে পূজিত, নরঘাতী দস্যু অঙ্গুলিমাল ভক্তে পরিণত, মদ্যাসক্ত গিরিশ সাধক গিরিশে রূপান্তরিত। এ যেন অঙ্ককষা ফলের মত। ক'রলেই হবে, আর হওয়াই পাওয়া। একটু

নিঃস্বার্থভাবে ঐরকম দিব্য জীবনকে ভালবাসা, তাঁ'তে অনুরক্ত হওয়া চাই।

প্রবৃত্তির পীড়ন যতই থাকুক, তা' নিয়েও তাঁ'কে ভালবাসা চাই—নিতান্ত আপনার জনের মতন ক'রে। আর, ভালবাসার সাথে করার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই, তাঁ'র জন্য করাটাও চাই। এই অকৃত্রিম অস্খলিত সক্রিয় ভালবাসাই মানুষের মনে শান্তির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। নিজেকে অমনতর পুরুষের চরণে প্রত্যাশা-বিহীনভাবে বিলিয়ে দিয়েই সে অনুভব করে আত্ম-তৃপ্তি। তাঁ'র সেবা ক'রেই সে ধন্য হয়। সে চায় না কিছু, কিন্তু না চাইতেই পায় অজস্র। সর্ব্বদরদী উপাস্তকে ভালবেসে সে নিজেও হ'য়ে ওঠে মহাপ্রেমিক।

এইভাবে জগৎ ভগবানের সাথে ভক্তেরও মর্য্যাদা দিয়ে এসেছে। রামসীতার পূজা হয়। কিন্তু মহাবীর হনুমানের উপাসক সংখ্যাও আমাদের দেশে কম নয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের সাথে প্রভু নিত্যানন্দের নাম জড়িত হ'য়ে আছে 'গৌর-নিতাই' ব'লে। অমনতর মানবদরদী জগৎপ্রেমিক দেশকালের দ্বারা কখনও সীমাবদ্ধ থাকেন না। তাঁ'রা যে-কোন দেশে, যে-কোন সময়ে, যে-কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবির্ভূত হ'তে

পারেন। কিন্তু সেই আবির্ভাব সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার লোকের জন্যই। নিত্যকালের মানুষ উপকৃত হয় তাঁদের দিব্য জীবন ও বাণীর দ্বারা। তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতি মানুষের কাছে আদর্শস্থানীয় ব'লে গণ্য হয়। জীবনরসের জোগান মানুষ তাঁদের কাছ থেকে পায় ব'লে তাঁদের ভগবানের আসনে বসিয়ে পূজা ক'রে থাকে—অন্তরের ভক্তি-উপচার দিয়ে। আর, তাঁদের এ সম্বর্দ্ধনার মূল নিহিত ঐ শাশ্বত আচার্য্যসেবারূপ প্রথার ভিতরে।

সপ্তদশ অধ্যায়

দানফল

শাশ্বত সনাতন ইষ্টব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষগণ নানাভাবে ব'লে গেছেন নিত্য ইষ্ট-ভরণের কথা। ইষ্ট মানেই মঙ্গল। তাই, মঙ্গলার্থে, মঙ্গল যা'তে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে তা'রই জন্য নিত্য কিছু দান করার ব্যবস্থা আছে।

"অদত্ত্বা যৎ কিঞ্চিদপি ন নয়েদ্ দিবসং বুধঃ ॥" ২০৫ ॥

(শুক্রনীতিসার, ৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ কিছু না দিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি দিন পার ক'রবেন না। কী দিতে হবে?—যা' বাস্তব প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু 'ভরণ' কথাটা যখন আসছে, তখন তা'র মধ্যে খাদ্যও অন্তর্ভুক্ত হয়—শরীরের যা'তে পুষ্টি আনে। এই যে শ্রেয়-উদ্দেশ্যে নিত্যদান, এর কথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় সুন্দর এবং পরিষ্কার ক'রে ব'লে গেছেন তাঁ'র 'ত্যাগের ফল' নামক প্রবন্ধে। তিনি ব'লেছেন—

"সংসারের মাঝখানে থেকে অন্ততঃ একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে দাও। সেই মঙ্গলযজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোট দরজাও যদি খুলে রাখ তাহ'লে দেখবে, আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ ক'রে উঠছে, যা'র মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না, ক্রমেই তা' খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মত হ'য়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হ'য়ে তা' ক্রমশঃই বিস্তৃত হ'তে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহো-রাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতি-দিন একবার অন্ততঃ মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারী তাঁ'র ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই

আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁ'কে যদি একমুঠো ক'রে দান করা আমরা অভ্যাস করি, তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধ'রবে না, ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁ'কে যেটুকু দেব, সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তা'র জন্য মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চ'লবে না। কেন না, লোককে দেখিয়ে দেওয়া, সেটুকু একরকম ক'রে দিয়ে অন্যরকম ক'রে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুককে যা' দিতে হবে, তা' অল্প হ'লেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তা'র হিসেব রাখলে হবে না, তা'র রসিদ্ চাইলে চ'লবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোন দান যেন এই-রূপ পরিপূর্ণ দান হ'তে পারে। সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এতটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁ'রই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।" (শান্তিনিকেতন)

এই কয়টি কথার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুই ব'লতে বাকী রাখলেন না। কেমনভাবে দিতে হবে, কখন

দিতে হবে—সব কথাই ব'ললেন। শ্রেয়ভরণের ভিতর-দিয়েই যে শ্রেয়লাভ হয়, তা'ও অতি স্পষ্ট-ভাষায় ব'ললেন।

সেদিনও ব'লেছেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—

"আর দেখ, যখন আসবে তখন হাতে ক'রে একটু কিছু আনবে। নিজে ব'লতে নাই—অভিমান হয়। অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিস্।....কিছু খাবার আনবে। এতে খুব ভাল হয়।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)

বহুজনের ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর চাইছেন না যে, তিনি নিজমুখে মানুষকে বলেন তাঁ'কে কিছু দিতে। শিষ্যবর্গের মধ্যে স্বতঃই এ বোধ জাগ্রত হোক, এই তাঁ'র ইচ্ছা। আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রতে হবে যে, সেই দেওয়াটা কিছু খাদ্য হওয়াই ভাল।

শ্রেয়কে প্রথম অর্ঘ্যপ্রদানের রেশ আজও আমাদের দেশে যেভাবে আছে, তা' দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। এখনও বাংলার গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর গাছের প্রথম ফল বা ক্ষেতের প্রথম ফসল দেওয়ার

বিধান আছে পুরোহিতবাড়ীতে বা কোন সদ্‌-ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অথবা কোন দেবমন্দিরে। এখনও অনেকে তাঁ'দের ঠাকুরবাড়ীতে বা কোন ভাল বামুনের ঘরে আম-দুধ উৎসর্গ না ক'রে নিজেরা তা' খান না। এমন-কি, যে-ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নারায়ণশিলা আছেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই বাড়ীতে বাড়ীর প্রথম জিনিষটি দিয়ে আসেন।

আবার, নতুন চা'ল উঠলে নবান্ন হয়। বাংলায় বর্দ্ধমান, বীরভূম, প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জায়গায় 'নবান্ন' রীতিমত একটি উৎসব। ঐ সময়ে পিতৃপুরুষগণকে নবতণ্ডুল উৎসর্গ করা হয়। প্রথমে পুরোহিত বা কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সাড়ম্বরে ঐ নবান্ন পৌঁছে দেওয়া হয়। দেবতার নামেও উৎসর্গ করা হয়। এইভাবে নবান্ন-উৎসব দ্বারা দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের একটি ক্ষীণধারা এখনও অব্যাহত আছে আমাদের দেশে। শুধুই কি তাই? ঐ নবান্নের দিনে অতি ভোরে উঠে বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা কাককে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসে।

"কা—কা—

আমাদের বাড়ী শুভ নবান্ন খা—।"

—এই ছড়ায় বায়সের নিমন্ত্রণপ্রথা কিছুদিন আগেও পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যেত। নবান্ন প্রস্তুত ক'রে একটা উঁচু জায়গায় কাকের জন্য রেখেও দেওয়া হ'ত। আবার, গরুকে ডেকে নবান্ন খাওয়ানো হ'ত। ঢেঁকির গায়েও নবান্নের ফোঁটা দিয়ে আসা হ'ত। কারণ, ঢেঁকি সারা বছর ধ'রে আমাদের চা'ল প্রস্তুত করার সাহায্য ক'রবে। তা'রপর বেলা হ'লে গৃহস্থ বহু লোককে ডেকে ঐ নবান্নের প্রসাদ তো দিতেনই, তা' ছাড়া সেদিন দুপুরেও ঐ বাড়ীতে বিরাট্ ভোজের আয়োজন হ'ত। এইভাবে ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞও বাদ যেত না। আজও বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল নবান্নের সময়ে ঐরকম ব্যাপক আনন্দে মেতে ওঠে। নবান্নের দ্বারা বাস্তবে পঞ্চ-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে মানুষ তা'রপর থেকে নতুন চা'ল খাওয়া সুরু করে।

আবার, অনেক বড়-বড় ব্যবসায়ী মহাজন এখনও দৈনিক হিসাবের খাতায় খরচের আগে 'ঈশ্বরবৃত্তি' ব'লে একটা অংশ লিখে রাখেন। ঐ ঈশ্বরবৃত্তিতে যে-অর্থ তাঁদের জমে, তা'র দ্বারা তাঁ'রা নানারকম ধর্ম্মীয় উৎসব, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি ক'রে থাকেন।

এ-সবই শ্রেয়কে তথা পারিপার্শ্বিককে প্রথম অর্ঘ্য-দানেরই প্রতিচ্ছবি। এগুলি আজও আমরা করি। তা'র মানে, অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঐ শ্রেয় বা ইষ্ট-ভরণক্রিয়াই ক'রে চলেছি আমরা। তাহ'লে সোজা-সুজি দৈনিক কর্ম্মারম্ভের প্রথমে নিত্য ইষ্টার্ঘ্যপ্রদানের কথা শুনে চ'মকে ওঠার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

সুদূর ঋষিযুগ থেকেই এই প্রথা চ'লে এসেছে আমাদের দেশে। অনেকে কথা তুলবেন, ঋষিযুগে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তা' সম্ভব নয় সত্য। কিন্তু কল্যাণকর অনুষ্ঠান যেগুলি, সেগুলি বর্জ্জন না ক'রে দেশকালোপযোগী ক'রে আমরা গ্রহণ ক'রতে পারি। একথা তো কখনও বলি না যে, আগেকার দিনে মা-বাবাকে প্রণাম করা সম্ভব হ'ত। এখন আর তা' সম্ভব নয়। কেন বলি না? কারণ, শিষ্ট ঐতিহ্য বা প্রথা যেগুলি, যে আচরণ-গুলির মধ্যে প্রাণের স্পর্শ আছে, তা' আমাদের কাছে সব সময়ের জন্যই প্রিয় হ'য়ে থাকে। প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, স্নেহ, পরোপকার ইত্যাদি গুণগুলি জীবনের শাশ্বত সম্পদ্। তাই, সেগুলি কালজয়ী হ'য়ে মানুষের মনে বিরাজ করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইষ্টভজন

ইষ্টভরণপ্রক্রিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে যেমন ক'রে ছিল, এমনটা আর কোথাও দেখা যায় না। এখানে নিত্যকর্ম্মের প্রারম্ভে ইষ্টার্থে স্বোপার্জ্জিত অর্ঘ্য দান করাটা একটা সহজ স্বতঃ-উৎসারিত বিধান। পিতা-মাতার সেবা এখানে নতুন ক'রে কাউকে শেখাতে হয় না। গুরুকরণ এবং ধর্ম্মীয় আচার-পরিপালন এদেশের যেন রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে আছে। আর, এই সম্পদ্ নিয়েই ভারতভূমি চিরকাল পৃথিবীর চোখে সম্মাননীয় হ'য়েই আছে। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আধ্যাত্মিকদর্শন-পিপাসুরা এখানে ছুটে আসেন প্রাপ্তির লোভে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রতিটি ধূলিকণা এদেশের গৌরব বহন ক'রছে। অসংখ্য ঋষি-মহাপুরুষের পাদস্পর্শে এদেশ ধন্য, পবিত্র। এখানকার নালন্দা, তক্ষশিলায় জ্ঞানচর্চ্চার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ভীড় ক'রতেন। এই দেশের ব্রাহ্মণগণ-সম্বন্ধে মনুসংহিতাও ব'লেছেন—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" ২০॥
(২য় অধ্যায়)

—এই দেশের অগ্রজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ স্বীয়-স্বীয় আচারবিধি শিক্ষা ক'রে যাবে। আর, ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রলে আমরা তা'র প্রমাণ অজস্রভাবে পাই। তাই, এই দেশের বৈধ আচার-আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব সব সময়েই স্বীকৃত হ'য়ে আছে।

শ্রীভগবান্ এই দেশেই নানা রূপে অবতীর্ণ হ'য়ে ধর্ম্মের গ্লানি নাশ ক'রে ধর্ম্মের বাস্তব জীবনীয় রূপ দান ক'রে গেছেন। দেশকালের বিভিন্নতা-অনুসারে তাঁদের কথার ভঙ্গীও বিভিন্ন হ'য়েছে। কিন্তু মনোনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে যে, সমস্ত কথারই উদ্দেশ্য এক। ঈশ্বরপ্রাপ্তিই জীবনের লক্ষ্য এবং গন্তব্য—এই কথাই তাঁ'রা বার-বার ঘোষণা ক'রে গেছেন। আর, স্বীয় জীবন দিয়ে তাঁ'রা দেখিয়ে গেছেন তা'র উপায়। এ দেশের ঋষি ব'লে গেছেন—

"আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপতীতি॥" ৩॥
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৪র্থ অধ্যায়, ৯ম খণ্ড)

—আচার্য্য হ'তে বিজ্ঞাত বিদ্যাই সাধুতম বা কল্যাণতম হ'য়ে থাকে। আবার, আছে—

"গুরুপ্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ॥" ১৪ ॥
(শিবসংহিতা, ৩য় পটল)

—গুরুর প্রসাদেই নিজের সবরকম কল্যাণ লাভ হয়। সেই কারণে, নিত্যই গুরুসেবা করা উচিত। অন্যথা ক'রলে শুভ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে আরো স্পষ্টভাবে বলা হ'ল—

"এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥" ৪১ ॥
(৮০তম অধ্যায়, ১০ম স্কন্ধ)

—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নিজের যা'-কিছু ইষ্টার্থী ক'রে তুলে প্রতিটি সৎ শিষ্যেরই কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে গুরুর স্বার্থরক্ষা করা।

আচার্য্য বা গুরুর প্রতি অকাট্য অনুরাগের ভিতর-দিয়েই ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে যাওয়া যায়। তাই, ভাগবতে 'কেবলা ভক্তি', 'একভক্তি' প্রভৃতি কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত আছে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তাঁকেই বলা হ'য়েছে, যা'র মন একলহমার জন্যও ঐ গুরুরূপী ভগবানের চরণ হ'তে বিচ্যুত না হয়—

"ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥" ৫৩ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় অধ্যায়, ১১শ স্কন্ধ)

আর, চরণ মানেই চলন, আচার, আচরণ; শুধু পা নয়। ভগবানের নির্দ্দেশমত যদি না চলি, তাঁ'র গুণরাজিতে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যদি প্রচেষ্টাপরায়ণ না হই, তাঁ'র ইচ্ছাকে যদি আমার প্রতিনিয়ত আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে না তুলি, তবে কোটি বছর ধ'রেও শুধু পদসেবা ক'রে গেলে কোনই ফল হবে না। বাস্তব ভক্তি অর্থাৎ ভজন চাই, চাই তাঁ'তে সক্রিয় অনুরাগ। ভক্ত কখনও নিষ্কর্ম্মা হয় না, সে হয় ভীমকর্ম্মা। রাক্ষসরাজ্যের কোন বাধাই ভক্তবীর হনুমানকে আটকে রাখতে পারেনি। তিনি সব বাধার উপর দিয়ে ঠিক জয়ী হ'য়ে মা-জানকীর সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন প্রভু রামচন্দ্রের কাছে। রাক্ষসপুরী থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল তাঁ'কে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। ইষ্টের প্রতি অচ্যুত ভালবাসার টানে কৌশল ও ধীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁ'র মাথায় আপনা থেকেই গজিয়ে উঠেছিল। এই-ই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। ইষ্টের প্রতি সক্রিয় ভক্তি মানুষকে এমনতরই তৎপর ক'রে তোলে।

এই ধরণের ইষ্টসংন্যস্ত সার্থক জীবনের কাহিনী সেখানেই পাওয়া যাবে, যেখানে মানুষ অটুটভাবে গুরুমুখী হ'য়ে নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের ত্রিবেণীসঙ্গমে পরিস্নাত ও অভিষিক্ত হ'য়ে উদ্দাম চলায় চ'লেছে। সে-সার্থকতা দেখে আমরা অবাক্ হ'য়ে যাই। যে-যে প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে ঐ জীবনগুলি সাফল্য-লাভ ক'রেছে, সেই তুকগুলি জেনে ঠিকমত ক'রে চ'লতে পারলে আমরাও সে-ফলের অধিকারী হ'তে পারি।

প্রথমে, জীবনে চাই একজন কেন্দ্রপুরুষ; তাঁকে আচার্য্য, ইষ্ট বা গুরু যে-নামেই অভিহিত করি না কেন। তা'র পর তাঁতে অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে চিন্তা-বাক্-কর্ম্মে তাঁরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে এগিয়ে চলা চাই। ভগবান্ যীশুখ্রীষ্ট কম্বুনিনাদে ঘোষণা ক'রেছেন—

"Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment."

(St. Matthew, Chap. 22, Verse 37—38)

—তোমরা তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরকে সমস্ত অন্তঃকরণ, সত্তা ও মন দিয়ে ভালবাসবে। এই-ই প্রথম ও মহান্ অনুশাসন। সেই প্রভু স্বয়ং খ্রীষ্ট। তিনি ও তাঁ'র পিতা অভিন্ন। তিনি ব'লেছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না। তিনিই সেই অবলম্বন বা চালক, যাঁকে আশ্রয় ক'রে আমাদের ব্রহ্মলাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি-লাভ বা সম্বর্দ্ধনার পথে যেতে হবে। তাই, তাঁ'রই সেবাতে ঈশ্বরের সেবা হয়। ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি তিনিই—নরবিগ্রহধারী জীয়ন্ত ইষ্টদেব। তৎকালীন যুগের নিষ্ঠাবান্ ভক্তবৃন্দ ঐ ইষ্টরূপী যীশুখ্রীষ্টের বাস্তব সেবা ও ভরণপোষণের দায়িত্বেই আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। আর, প্রকৃত শিষ্য হ'তে গেলেও অন্ততঃ কী চাই, সে-সম্বন্ধে তাঁ'র উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যীশু ব'লছেন—

"Whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple."

(St. Luke, Chap. 14, Verse 33)

—তোমাদের মধ্যে যে-ই হো'ক, যে তা'র যা'-কিছু আছে, সবই ত্যাগ করতে পারেনি, সে আমার শিষ্য হ'তে পারবে না।

আরো ৬০০ বৎসর পরে এশিয়ার পশ্চিম ভূখণ্ডে আরবে ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের ঐ বাণীর অদ্ভুত মূর্ত্তনা দেখতে পাই আমরা। পরমপ্রেমিক মানবদরদী হজরত মহম্মদ (সঃ) একবার শিষ্যদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনে কিছু অর্থ চাইলেন। সবাই কিছু-কিছু ক'রে এনে দিলেন। কিন্তু ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবুবকর তাঁ'র নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না রেখে সমস্ত ধনসম্পদ্ এনে দিলেন তাঁ'র গুরুর চরণে। বাড়ীর লোকের জন্য কী রেখে এসেছেন, জিজ্ঞাসিত হ'য়ে আবুবকর উত্তর ক'রলেন—"খোদা এবং তাঁ'র প্রেরিত মহম্মদই আছেন।" কী জ্বলন্ত বিশ্বাস! কত বড় আত্মত্যাগ! যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করা আর কা'কে বলে! পরমারাধ্য ইষ্টদেবের প্রয়োজনে সমস্ত ধন ন্যস্ত ক'রে আবুবকর বাস্তবভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞের সাধু অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভক্তিতে শ্রেয়লাভ

ভারতে নিত্য গুরুভৃতি বা আচার্য্যভরণের বিধি যেভাবে বিদ্যমান, অন্যত্র ঠিক সেরকমটা না থাকলেও রকমারি ক'রে আছেই। পুরুষোত্তমগণের জীবন ও বাণীর আলোচনাপ্রসঙ্গে সেগুলি আমরা বার বার ক'রে দেখতে পাই।

হজরত মহম্মদ (সঃ) ইস্‌লামধর্ম্মের অবশ্য পালনীয় যে আচার-আচরণগুলির কথা ব'লেছেন, তা'র মধ্যে 'জাকাৎ' অর্থাৎ ইষ্টার্থে বা ধর্ম্মার্থে দান একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ; পবিত্র কোরান-শরিফের একটা বাণীতে আছে—

"যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, জাকাৎ দিয়াছে, যাহারা অঙ্গীকার পালন করে ও দারিদ্র্য কিংবা নানা বিপদাকীর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তাহারাই পুণ্যবান্, সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু।"

(২য় সুরা, ১৭২তম আয়ত)

পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে 'জাকাৎ' অবশ্য পালনীয় অঙ্গ। ইমেনের শাসনকর্ত্তা মায়াজকে নানা উপদেশের মধ্যে

ইমেনের জনসাধারণ সম্বন্ধে একটা কথা হজরত রসুল (সঃ) ব'লে দিয়েছিলেন—

"যদি তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে জাকাৎ দিতে বলিও।"

(হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি। ১৪শ পরিচ্ছেদ)

কী দেখলাম! যদি ইমেনপ্রদেশের মানুষ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, গুরুকরণ করে, তবে তাঁদের জাকাৎ অর্থাৎ ইষ্টার্থে দানও অবশ্য করণীয় হবে। এই-ভাবে নানারকমে হজরত মহম্মদ (সঃ) জাকাৎ-দানের কথা ব'লে গেছেন। আবার, তাঁর জীবনচরিত-পাঠে আমরা জানতে পারি যে, যে-সব জাকাৎ বা অন্যান্য উপহার তিনি পেতেন, সেগুলি আবার লোককল্যাণার্থেই বিনিয়োগ ক'রতেন। কোরবাণীও এই ইষ্টার্থে প্রিয়তম বস্তু দানেরই নামান্তর। বাইবেলেও এই দানের কথা পাওয়া যায়—"Offer the sacrifices of righte-ousness." (The Psalms. Book 1. 4 : 5) —ধর্ম্মের অবদান উৎসর্গ কর।

এইভাবে পর্য্যালোচনা ক'রলেই আমরা দেখতে পাব, জগতের প্রতি ধর্ম্মগুরুই বিভিন্নভাবে ব'লে

গেছেন ইষ্টভরণ বা গুরুভরণের কথা। ক্ষেত্র ও মাত্রানুপাতিক যেখানে যেমন দরকার সেখানে তেমন-তরই ব'লেছেন। কিন্তু এই আচারের সর্ব্বাঙ্গীণ পরি-পূর্ণতা আমরা দেখতে পাই ভারতভূমিতে। কারণ, ভারতীয় দর্শনে প্রতিটি বিষয় ও ব্যাপারকেই দেখা হ'য়েছে গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে। প্রতিটি সত্যেরই অন্তঃস্থ তাৎপর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-সহকারে উদ্‌ঘাটিত করা হ'য়েছে। ঋষিদের অনুশাসনগুলি বহু ভাষ্যকার বহু রকমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার ক'রেছেন। এইভাবে প্রতিটি অনুশাসনই কালজয়ী আসন গ্রহণ ক'রে মানবচিত্তে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে। আবার, যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হ'য়েই আছে ধর্ম্মাচারের লীলাক্ষেত্র ব'লে, সেজন্য এখানকার আচারেরও শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আজ পঙ্কিল মোহা-বর্ত্তে হাবুডুবু খেয়েও আমরা এই শ্রেয়জীবনের পথ অবলম্বন ক'রছি না। মঙ্গল চাই সবাই, সকলেই ভালভাবে বাঁচতে চাই। কিন্তু স্বস্তিপূর্ণ জীবনলাভের যে অমিয় তুক, তা' আশ্রয় ক'রতে চাই না। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ

করাকে ভাবি বন্ধন। তাঁ'র ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করাকে মনে করি অপব্যয়। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত জগতের কোথাও শ্রেয়জীবনকে আশ্রয় করা এবং তাঁ'র বাস্তব সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া জীবের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ ও সম্পূর্ণতা আসেনি। জীবনে কৃতী অনেকে হ'য়েছেন বটে। কিন্তু ইষ্টপ্রেমে মাতোয়ারা মুক্ত ব্যক্তিত্বের যে শিষ্ট কৃতিত্ব লাভ হয়, তা'র তুলনা কিছুতেই হয় না। ভক্তি, মুক্তি সবই সেখানে। তাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত ব'লে মানি ?।
কৃষ্ণপ্রেম যা'র—সেই মুক্ত শিরোমণি ॥" ২০৩ ॥
(৮ম পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা)

বিংশ অধ্যায়

ইষ্টভৃতি

আজ পৃথিবীর চরম দুর্দ্দিন উপস্থিত। ধর্ম্মের গ্লানি বুঝি চরম সীমায় এসে ঠেকেছে। সর্ব্বত্র

অশান্তি, সর্ব্বত্রই অতৃপ্তি। সর্ব্বত্রই শূন্যতার হাহাকার। যা'র অনেক আছে, তা'রও জীবন ফাঁকা। পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন—সর্ব্বত্রই ভাঙ্গন। ধৃতি ব'লে কিছু নেই, স্থিরতা ব'লে কিছু নেই। অথচ বাঁচার কামনা আছে, ভাল থাকার চাহিদা আছে। কিন্তু কিভাবে যে সেই বেঁচে থাকা বা ভাল থাকাটা সম্ভব হয়, তা' মানুষ আবিষ্কার ক'রতে পারছে না। নানারকম ধারণার বশীভূত হ'য়ে সে অক্লান্তভাবে নানা বিষয়ের পানে ছুটে চ'লেছে। কিন্তু এই ছোটাই একদিন এনে দিয়েছে তার ক্লান্তি। অবসাদে সে ঝিমিয়ে প'ড়েছে। এইভাবে প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির তাড়নায় অনিষ্ট বস্তুর পিছনে দৌড়াদৌড়ি ক'রে মানুষ তেজ, বীর্য্য, সাহস সবই হারাচ্ছে। এই-ই বর্ত্তমানের প্রকট চিত্র। মানুষ ভুলে গেছে যে, ঈশ্বরে অটুট এবং অখণ্ড বিশ্বাস ছাড়া কিছুতেই জীবনে শান্তি আসতে পারে না। আর, এখন আমরা ঈশ্বররূপী পরমার্থকে পশ্চাতে রেখে শুধু অর্থের মধ্যে শান্তি খোঁজার বৃথা চেষ্টা করি। কিন্তু এতে হবে না। চাই—অস্খলিত ঈশ্বরানুরাগ।

প্রশ্ন উঠতে পারে,—সেই অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয়,

অব্যক্ত, নিরাকার ঈশ্বরে মনঃস্থির করা কিভাবে সম্ভব? কথা ঠিক। তার জন্য আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণবাচক ভাবমূর্ত্তি বহু দেবতার কল্পনা করা হ'য়েছে। এই দেবগণের যে-কোন মূর্ত্তিতে মন স্থিরীকরণের দ্বারা চিত্তের কিছুটা প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। তাতে মন খানিকটা কেন্দ্রীভূত হয়, পুরাপুরি হয় না। কারণ, ঐ কেন্দ্রীকরণের কিছুটা বিধিবিধান আছে। সেগুলি ভালভাবে জেনে মনকে অহরহ তদ্‌ভাবভাবিত রাখা চাই। তার জন্য প্রয়োজন কোন তত্ত্ববেত্তা জীবন্ত পুরুষ, যিনি তাঁর চৈতন্য-সমাধিময় জীবনের দ্বারাই মানুষকে তত্ত্ব (তৎ-ত্ব) বা তাহাত্ব স্বরূপতঃ উপলব্ধি করাতে পারেন। আর, সেই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশ একমাত্র মানুষের মাঝেই সম্ভব, অন্য কোথাও নয়।

"চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।
ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে ॥" ১৪ ॥
(কুলার্ণবতন্ত্র, ১ম উল্লাস)

—দেহিগণের চুরাশি লক্ষ শরীরের মধ্যে একমাত্র মানব-শরীর ব্যতীত অন্য শরীরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না।

যুগে-যুগে আর্ত্ত নিপীড়িত মানুষের অন্তরের বাঁচার আকুল প্রার্থনার রূপ মূর্ত্ত ও ঘনীভূত হ'য়ে জগতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হ'য়েছে। বর্ত্তমান যুগও সেই অবস্থারই ইঙ্গিত করে। এই তো তাঁ'র আসার সময়। তিনি এসেছেন। আসতে তাঁ'কে হবেই। তাঁ'রই সৃষ্ট সন্তানের আকুল আহ্বান উপেক্ষা ক'রে তিনি তো দূরে থাকতে পারেন না। লক্ষ-লক্ষ মানুষের হৃদয়ের ব্যথা মোচন ক'রতে নররূপ ধারণ ক'রেই যে তিনি নেমে আসেন আমাদেরই মধ্যে, আমাদের এই মাটির ঘরে। তাঁর দিব্যজীবলীলায় সমস্ত অন্ধকার দূর হ'য়ে যায়, মানুষের মনের কালিমা ঘুচে যায়। এই তো তাঁর নিত্যযুগের ইতিহাস। আজও তা'র ব্যতিক্রম হয়নি, হ'তে পারে না। হ'লে সমস্ত শাস্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে যায়, ঋষিবাক্য নিষ্ফল হ'য়ে যায়, তাঁ'র শ্রীমুখোচ্চারিত আশ্বাসবাণীও তো মিথ্যা হ'য়ে যায়। তা' হয় না। তিনি নিশ্চয়ই এসেছেন, বিরাজ ক'রছেন ভূতদেহে, ভূতমহেশ্বর-ভাবের পূর্ণ-প্রকটিত লীলাখেলায়।

আজ এই বিরাট সম্ভাবনাময় সুযোগের অবহেলা যেন আমরা না করি। ভুলে যেন না যাই—ঝড়ের রাতে,

দুঃখের ঘনঘটায়, বিপর্য্যয়ের মহাবিধ্বস্তির মধ্য-দিয়েই কিন্তু জেগে ওঠেন তিমিরবিদারী। দুর্দ্দশা যত প্রচণ্ড, তাঁ'র আগমনসম্ভাবনাও ততই জ্বলন্ত; জগতের মহাসুদিনও ততই আগতপ্রায়। আর, সেই পরম মুহূর্ত্তে যে-ক'য়টি মানুষ অচ্যুতভাবে তাঁ'কে আশ্রয় ক'রে সেবাশুশ্রূষায় তাঁ'কেই নন্দিত ক'রে চলে, ভাগ্যবান্ তা'রাই, পুণ্যাত্মা তা'রাই, তা'রাই জাতি ও দেশের মহান্ কল্যাণদূত, অমৃতপতাকাবাহী দিব্য স্বস্তিসেবক তা'রাই। এমনতর ভক্তেরই গৌরব উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হ'য়েছে নারদভক্তি-সূত্রে। সেখানে বলা হ'য়েছে, অমনতর শিষ্ট সাধকগণ—

"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি, সুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি, সচ্ছাস্ত্রী-কুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি ॥ ৬৯ ॥

যতস্তন্ময়াঃ ॥ ৭০ ॥

মোদন্তে পিতরো, নৃত্যন্তি দেবতাঃ, সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১ ॥"

—সর্ব্বক্ষণের জন্য তদ্গতচিত্ত থাকার জন্য তাঁরা তীর্থ-সমূহকে প্রকৃত তীর্থে পরিণত করেন, সকল কর্ম্মকেই সুকর্ম্মে পরিণত করেন, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন ক'রে তাকে সৎশাস্ত্রে উন্নীত করেন। এঁদের লাভ ক'রেই পিতৃগণ আনন্দ প্রাপ্ত হন, দেবগণ নৃত্য করেন,

এই পৃথিবীও যেন সপ্রভু হয়।—বর্ত্তমান জগতেও অমনতর একজন সৎ আদর্শপুরুষের একান্ত প্রয়োজন, যিনি সমাজের প্রতিটি অবস্থাকেই যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে মানবকুলকে অভ্রান্ত কল্যাণপথে পরিচালিত ক'রতে পারেন। অবশ্য একথা ঠিকই যে, যার গ্রহণ করার মনোবৃত্তি আছে, অন্তর যার ঐ বেত্তাপুরুষের আদেশপালনে সতত উন্মুখ, সে-ই পথের নিশানা পেতে পারে। করুণার বাতাস বইছেই; কিন্তু আমাকে তো পাল তুলে দিতে হবে। তবে উপলব্ধি ক'রতে পারব ঐ করুণা। তাই, আগে আমাকেই দিতে হবে; তারপর বুঝতে পারব তাঁর দয়া।

ইষ্ট কোথায়? কী রূপে তাঁ'র অবস্থিতি? তাঁ'কে আগে বের করা চাই। তাঁ'র চরণে উপনীত হ'য়ে তাঁ'রই মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ ক'রে দীক্ষিত হ'তে হবে। শুধু কথায় নয়, তনু-মন-ধন বাস্তবভাবে তাঁ'র সেবায় সমর্পিত ক'রে তাঁ'র যোগ্য শিষ্ট সেবক হ'য়ে উঠতে হবে। একটুও প্রত্যাশা বা স্বার্থচাহিদা যেন না থাকে সেখানে—কেবল তাঁ'র সুখস্বস্তি-বিধান ছাড়া। তৎচিন্তা, তদনুধ্যান, তৎকর্ম্মনিষ্পাদনই যেন জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। মনে পড়ে

শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় নরবিগ্রহ শ্রীভগবানের অমোঘ নিদেশ—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" ৬৫ ॥
(১৮শ অধ্যায়)

—তুমি আমাগত-চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর; আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, তুমি আমাকে পাবে। একথা সত্য। তুমি আমার প্রিয়পাত্র। এইতো চলার কথা। তাঁ'রই মনন, তাঁ'রই ভজন, তাঁ'রই যাজন—এই-ই একমাত্র সম্বল, যা'তে তাঁ'কে পাওয়া যাবে। আর, তাঁ'কে পাওয়া মানে তাঁ'র গুণে গুণান্বিত হওয়া। ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানেও তেমনি ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত হ'য়ে ওঠা। তা'রই জন্য চাই, নিত্য ঐ নররূপী ভগবানের পূজা অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনা, যা'তে তিনি সর্ব্বতোভাবে সম্বর্দ্ধিত হন তা' করা; তাঁ'র ভজন অর্থাৎ তাঁ'র সেবা, তাঁ'র নির্দ্দেশের অনুশীলন, তাঁ'তে অচ্যুত অনুরাগ; এবং তাঁ'রই যাজন অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিটি রেণুতে-রেণুতে তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা, তাঁ'কেই উচ্ছল ক'রে তোলা। তাঁ'র মননই তাঁ'র যজন, পরিবেশে তাঁ'কে প্রতিষ্ঠাই

তাঁ'র যাজন, আর আচার্য্যের জীবনচর্য্যা ও কর্ম্মচর্য্যার দায়িত্ব-গ্রহণই ইষ্টভৃতি। ইষ্টভৃতিতে যেমন আছে, নিত্য আচার্য্যকে আহার্য্যনিবেদন ; সাথে-সাথেই আছে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত দিয়ে তাঁ'রই স্বার্থের রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা ক'রে চলা। কর্ম্মের সাথে-সঙ্গে চিন্তা ও বাক্য দিয়েও তাঁ'র ভরণ ক'রে চলা চাই।

অটুট নিষ্ঠার সাথে এই শাশ্বত সনাতন ইষ্টভরণ-প্রথাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলাই জীবনে ধৃতি, স্বস্তি ও শান্তিলাভের পরম পন্থা। স্খলিত হ'লে চ'লবে না, অনিয়মিত হ'লেও চ'লবে না, প্রত্যাশা থাকলেও হবে না। শুধু ইষ্টেরই জন্য, ইষ্টেরই প্রীত্যর্থে দিনের কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে ভক্তি-উপহৃত এই অর্ঘ্য ইষ্টেই সমর্পণ করা বিধেয়। মনে রাখতে হবে—

"ভক্তিরেব পরমার্থদায়িনী
ভক্তিরেব ভবরোগনাশিনী।
ভক্তিরেব পরবেদনপ্রদা
ভক্তিরেব পরমুক্তিকারিণী ॥"

(সূতসংহিতা, ৪।২৬।৩৮)

—ভক্তিই পরমার্থ দান করে, ভক্তিই ভবরোগ বিনষ্ট করে, ভক্তিই পরা জ্ঞান প্রদান করে, ভক্তিই (মানুষকে)

পরমা মুক্তিতে উপস্থিত করে।— ঈশ্বরভাবাভিষিক্ত সৎপুরুষে সক্রিয় ভক্তি ও অনুরাগ ব্যতীত কখনও শান্তি বা কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হয় না। এই পথ শ্রেষ্ঠ কল্যাণের পথ, কর্ম্মবন্ধন-মোচনের সহজ উপায়, উন্নতির সলীল সোপান। এই ইষ্টভৃতিই জীবনসাধনার প্রথম অর্ঘ্য, নিষ্ঠার পবিত্র স্থণ্ডিল, ধর্ম্মের শিষ্ট আধান, ভক্তির উদাত্ত আশ্রয়।

উপসংহারে পুনরায় স্মরণ করি নররূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" ৩০॥
(গীতা, ৯ম অধ্যায়)

—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে আমাকে ভজন করে, তা'কেও সাধু ব'লে মনে ক'রবে; কারণ, সে সম্যক্ প্রযত্নশীল। আর, এই অনন্যচিত্তে ইষ্টভজনাই যা'র জীবনের ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহকাল-পরকাল, ভক্তি-মুক্তি, যথাসর্ব্বস্ব, সেই ভক্ত সম্বন্ধে ভগবানের নিশ্চয়কারী আশ্বাসবাণীও নিত্য স্মরণীয়—

"কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥" ৩১ ॥

(গীতা, ৯ম অধ্যায়)

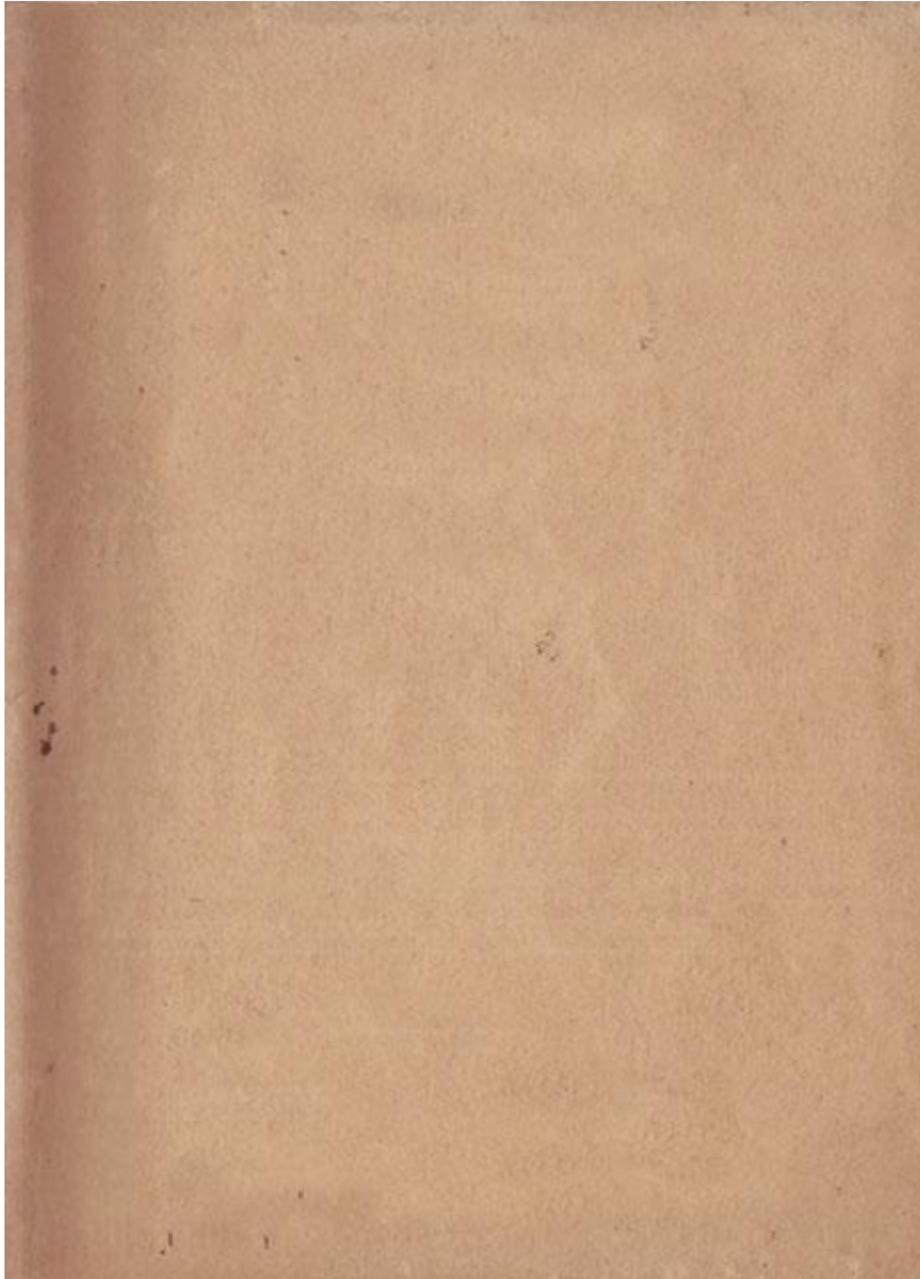
—হে কুন্তীনন্দন ! তুমি নিশ্চয় ক'রে জেনো, আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

গুরুনিষ্ঠা

সদ্‌গুরুর্হি চিরোপাস্য-
স্তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।
কর্ম্মণা মনসা বাচা
শিষ্যৈঃ সেব্যঃ সদা হি সঃ ॥
অত্যাজ্যঃ সর্ব্বকালেষু
নাস্য ত্যাগো বিধীয়তে।
গুরুত্যাগাৎ সমুদ্ধিঃ
সর্ব্বতো নিরুদ্ধা ভবেৎ ॥

ক্ষমা-প্রার্থনা

চিরবাঞ্ছিত! বন্দিত! শাশ্বত হে!
শিবনন্দন! সুন্দর! বিশ্বগুরো!
দ্যুতিরঞ্জক! পালক! চিন্ময় হে!
অনুকূল! বিভো! প্রণমামি পদে ॥



Satsang - Intobhriti Mohajoggo